



সেবক

গান্ধী সেবা সংঘের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

শ্রীভূমি, কলকাতা • ১৬ আশ্বিন ১৪৩৩ • রবিবার • ৪ অক্টোবর ২০২৬ • দ্বাদশ বর্ষ • জুলাই - সেপ্টেম্বর সংখ্যা

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভগিনী নিবেদিতা

ডাঃ শঙ্করকুমার নাথ

১৯০২ সালের সেপ্টেম্বর মাস। সদ্য স্বামী বিবেকানন্দের জীবনাবসান ঘটে গেছে (৪ জুলাই, ১৯০২)। ভগিনী নিবেদিতা খানিকটা একাকী অনুভব করছেন। তবু স্বামিজির প্রেরণা, আশীর্বাদ আর শুভেচ্ছাকে এগিয়ে নিয়ে চললো সামনের দিকে। স্বামিজির আদর্শ— ওঠো জানো, দেশকে জানো, দেশের মানুষকে চেনো, সামগ্রিকভাবে তার সভ্যতা, সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করো, আর তা থেকেই জন্ম নেবে জাতীয়তাবোধ আর সেখান থেকেই আসবে স্বাধীনতা। তাই বিদেশিনী নিবেদিতা ভারতকে স্বদেশজ্ঞানে জানতে বেরিয়ে পড়লেন দক্ষিণ ও উত্তর ভারত ভ্রমণে, সঙ্গে চললো প্রচুর পড়াশুনা। ভ্রমণে বেরিয়ে বড় বড় শহরে স্বাধীনতাকামী দেশনোতাদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হতে লাগলো।

অনেক সভাসমিতিতে উত্তেজনাপূর্ণ জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা দিলেন। পরাধীনতার জ্বালা বুঝিয়ে দিলেন; স্বাধীনতার স্পৃহা জগ্রত করিতে চেষ্টা করলেন। তিনি বেদান্তের মোক্ষ প্রচার করলেন না, সংসার মায়া ও মিথ্যা একথাও বললেন না।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের বৈচিত্র্যের মধ্যে একটা সাধারণ এক্য আছে। সমাজবিজ্ঞানে পারদর্শিনী নিবেদিতা এই এক্যকে ভাষারূপ দিয়ে বক্তৃতা দিতে লাগলেন। এই এক্যের উপর ভিত্তি করিয়া তিনি ভারতের জাতীয়তাকে প্রতিষ্ঠিত করলেন।^১

বোম্বাই, পুনা, নাগপুর, বুদ্ধগয়া, লাহোর, হায়দ্রাবাদ সব জায়গাতেই তাঁর বক্তৃতায় ভারতবাসী দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হতে লাগলো। এলেন বরোদায়। আরও একজন তাঁর সঙ্গে পরিচিত হলেন, তিনি বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ।

আমরা জানি, নিজের দেশের (আয়ল্যান্ড) মুক্তি-যুদ্ধে নিবেদিতা নিবেদিত প্রাণ ছিলেন, যে-দেশের স্বাধীনতা-যুদ্ধে নিবেদিতার গুরু ছিলেন বিপ্লবী জেগপাটকিন। সেই বিপ্লবী ক্ষুণ্ণলিপিকে স্বামী বিবেকানন্দ তো অগ্নিতে রূপান্তর করে দিয়ে গেছেন, তাই বিপ্লবী নিবেদিতার সঙ্গে এদেশের বিপ্লবী অরবিন্দর পরিচয় বন্ধুত্ব নিবিড় হতে একটুও সময় লাগেনি।

নিবেদিতা জানলেন, ইতিমধ্যেই অরবিন্দ কলকাতায় গুপ্ত-সমিতি গঠন করে ফেলেছেন। তাই তিনি খুব আন্তরিকভাবে অরবিন্দকে এই গুপ্ত-সমিতির কর্মকাণ্ডকে ত্বরান্বিত করতে কলকাতায় ফিরে যাওয়ার অনুরোধ করলেন।

বরোদা থেকে নিবেদিতা এবার ছুটলেন দক্ষিণে মাদ্রাজে অর্থাৎ বর্তমান তামিলনাড়ুতে। যেখানে বহু শহরে-জ্বালাময়ী বক্তৃতাতে স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখার প্রেরণা দিতে লাগলেন। দলে দলে মানুষ তাঁর বক্তব্য শোনার জন্য সভাতে ভিড় করতে লাগলো। একে তো তিনি ইতিমধ্যে বেশ পরিচিত পেয়ে গেছেন, তার উপর দক্ষিণের সংবাদপত্র “দি হিন্দু” পত্রিকায়

এর পর ২ পাতায়...

শিক্ষকতার সঙ্কট

হিরণ্ময় সাহা

শহরের একটা নামকরা বেসরকারি স্কুলে ইন্দ্রনীলবাবু পদার্থবিদ্যা ক্লাস নিচ্ছেন দশম শ্রেণীতে। চল-তড়িৎ অধ্যায় পড়তে গিয়ে তিনি তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশ বলতে কী বোঝায়, কোন কোন বিজ্ঞানী এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আবিষ্কার করেন এবং মানুষের ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগান— এই সমস্ত ব্যাপারে ছাত্রদের সঙ্গে বিভিন্ন তথ্য ও তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করবেন বলে প্রস্তুত হয়ে এসেছেন। ক্লাসে পড়ানো শুরু করে ইন্দ্রনীল বাবু বুঝতে পারলেন ক্লাসের ভালো ভালো ছাত্রদের অনেকেই এই সমস্ত তথ্য ও তত্ত্ব জানে। দশম শ্রেণীর পদার্থবিদদের পাঠ্যপুস্তক নয় গুগল ইউটিউব এবং সাম্প্রতিক দৌলতে। ইন্দ্রনীল বাবু আরো সমস্যায় পড়লেন যখন দেখলেন যে তিনি যে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর ও সমস্যার সমাধান ছাত্রদের বাড়ি থেকে করে আনতে বলছেন, সেই সমস্ত কিছুই সুন্দর নির্ভুল উত্তর প্রায় সব ছাত্রেরাই করে আনছে। প্রশ্নের উত্তর দেখে কে ভালো কে মন্দ বোঝার কোন উপায় নেই। ইংরেজি শিক্ষক শ্যামল বাবুর অভিজ্ঞতা আরো মারাত্মক। তিনি যখন ছাত্রদের কোন একটি বিষয় সম্পর্কে রচনা লিখতে দেন বা কোন গল্প তৈরি করতে বলেন প্রায় সব ছাত্রই সুন্দর সুন্দর রচনা ও গল্প লিখে নিয়ে আসে। দুই তিন বছর আগেও কিন্তু ছাত্রদের এতটা উজ্জ্বলতাই তিনি লক্ষ্য করেননি। ইন্দ্রনীলবাবু শ্যামলবাবু দুজনেই খেয়াল করেছেন যে ছাত্ররা কিন্তু ক্লাসে আর আগের মত মনোযোগী নয়। বরঞ্চ ক্লাসের শিক্ষকদের কাছ থেকে শেখার বা জানার আগ্রহ তাদের ক্রমশ যেন কমানির দিকে। তাহলে ব্যাপারটা কি হচ্ছে?

ঘর ঘর স্মার্টফোন

ব্যাপারটা হচ্ছে— গত ২ দশকে পৃথিবীটা অনেকটাই বদলে গেছে এবং আরো প্রতিদিন বদলাচ্ছে। ইন্টারনেট ও স্মার্ট মোবাইল ফোনের দৌলতে পৃথিবীর যাবতীয় তথ্য ও বিবরণ এখন ধনী-দরিদ্র শিক্ষিত-অশিক্ষিত বালক-বৃদ্ধ সবাইর করতলগত হয়ে গেছে। কোন কিছু শেখার, জানার, মনে রাখার জন্য কোন পরিশ্রম বা চেষ্টা করা প্রয়োজন নেই। মুঠোফোন খুলে গুগল স্যারের কাছে প্রশ্নটা করলেই হল। আফ্রিকার বা ইউরোপে কটি দেশ আছে, তাদের রাজধানীর নাম কি, দেশগুলো অবস্থান কোথায়, তাদের ভৌগোলিক বা ঐতিহাসিক গুরুত্ব কি— সব মুহূর্তের মধ্যেই জানা যায়— গুগল স্যারের দৌলতে। কাজেই কষ্ট করে ভুগোল বা ইতিহাস পড়ার দরকার কি? শুধু ভুগোল ইতিহাস নয়— ইংরেজি, বাংলা, বিজ্ঞান সব বিষয়েই এটা সত্য। ইংরেজি ক্লাসে শ্যামল বাবু খেয়াল করেছেন, কোন ছাত্রকে ক্লাসে হঠাৎ কোন প্রশ্ন করলে ইংরেজিতে উত্তর দিতে তাকে তোতলাতে হচ্ছে। কিন্তু বাড়ি থেকে কিছু লিখে আনতে বললে চোস্ত ইংরেজিতে সুন্দর নির্ভুল লিখে আনে। হোম টাস্ক দিয়ে ভালো খারাপ ছাত্রদের কোন পরিমাপ করা যাচ্ছে না।

এর পর ৩ পাতায়...

গান্ধী সেবা সংঘের সাধারণ সম্পাদক শ্রী গৌতম সাহাকে ইসিসারের সম্বর্ধনা

মধুমিতা মোদক

৮০তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের অঙ্গ হিসাবে ১৪ই আগস্ট ২০২৬, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টায় কালিন্দী হাউসিং-এর সেন্ট্রাল পার্ক অনুষ্ঠান মঞ্চে একটি আলোচনা ও সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করে ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর ইন্টার কালচারাল স্টাডিজ এন্ড রিসার্চ - ISSISAR।

এই অনুষ্ঠানে ব্যক্তিগত পরিসরে এবং বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থেকে সারাজীবন সমাজকল্যাণের কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখার জন্য গান্ধী সেবা সংঘের সাধারণ সম্পাদক শ্রী গৌতম সাহাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

ইসিসারের সম্পাদক ড. সুদীপ্ত চ্যাটার্জী তাঁর বক্তব্যে শ্রী গৌতম সাহা দীর্ঘদিনের নিঃস্বার্থ জনহিতকর কাজ, সাংগঠনিক দক্ষতা এবং জীবনকে বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার তাঁর সহজাত

প্রবণতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

বিগত ৪০ বছর ধরে ইসিসার শিক্ষা, সংস্কৃতি, গবেষণা ও সমাজকল্যাণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক স্তরে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। ইসিসার ওয়েলফেয়ার ইউনিট স্বাধীনতার ৮০তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এ বছর শ্রী গৌতম সাহাকে এই সম্মাননা প্রদান করে। সংগঠনের সভাপতি অধ্যাপক শান্তিনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁকে শাল পরিয়ে সম্মানিত করেন এবং মানপত্র ও ইসিসারের পদক তাঁর হাতে তুলে দেন। ইসিসারের পক্ষ থেকে প্রদেয় ১০, ০০০ টাকার অর্থ-সম্মাননার চেকটি শ্রী গৌতম সাহা ইচ্ছানুসারে গান্ধী সেবা সংঘের নামে প্রদান করা হয়।

সম্বর্ধনা গ্রহণ করে শ্রী গৌতম সাহা তাঁর



বক্তব্যে ব্যক্তিগত প্রয়াসের চেয়ে সমষ্টিগত প্রয়াস ও যৌথ সামাজিক জীবনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের আরও বেশি সমাজসচেতন হওয়ার এবং বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ গড়ে তোলা ও তা বজায় রাখার আহ্বান জানান তিনি।

এদিনের সভায় একই সঙ্গে সম্বর্ধনা জানানো হয় মানবাধিকার সংগঠন “সংস্থিতা”-কে। সংস্থাটি দীর্ঘদিন ধরে পারিবারিক ও সামাজিক নিগ্রহের শিকার মহিলা ও শিশুদের নিয়ে কাজ করে চলেছে।

সভায় উপস্থিত ছিলেন ICCR-এর প্রাক্তন অধিকর্তা শ্রী গৌতম দে, গান্ধী সেবা সংঘের সভাপতি অধ্যাপক হিরণ্ময় সাহা এবং ইসিসারের সভাপতি অধ্যাপক শান্তিনাথ চট্টোপাধ্যায়। শ্রী গৌতম দে ও অধ্যাপক হিরণ্ময় সাহা সংক্ষিপ্ত ও মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করেন।

গান্ধী সেবা সংঘের জন্য মুক্ত হস্তে দান করুন

সেবক

গান্ধী সেবাসংঘ

সংখ্যা - ৩, ৪ অক্টোবর ২০২৬
১৬ আশ্বিন ১৪৩৩

সম্পাদকীয়

‘সেবক’ পত্রিকা গান্ধী সেবা সংঘের মুখপত্র। এখানকার কার্যবিবরণী তুলে ধরা হয়। এই সংখ্যায় থাকবে জুন থেকে আগস্ট মাস অবধি সংঘ কর্তৃক আয়োজিত মানিক্যমঞ্চে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠান, বিভিন্ন সংস্থা; পরিবার ব্যক্তিগতভাবে সেবানিবাসীদের ঐকান্তিক সহযোগিতা। থাকছে লাইব্রেরীর বৈঠকী আড্ডা, স্বনির্ভর প্রকল্পের বাণিজ্যিক ভাবনা, আঞ্চলিক উৎসব। এছাড়া শিক্ষা সংস্কৃতির সচেতনায় বর্তমানে AI যুগে শিক্ষকদের বিরম্বনা, ISI নিয়ে কিছু কথা, বিশ্বজুড়ে যুদ্ধবাস্তা— তাই থাকল মার্কিন যুদ্ধ ৭ আগস্ট মাসকে মনে রেখে থাকবে সংগ্রামী নিবেদিতার কথা। থাকছে “পাঠকের দরবারে” অর্থাৎ সেবক পড়ে পাঠকের খোলা মনের কথা। গ্রাহক ও পাঠকদের আমরা গান্ধী সেব সংঘ পরিবারের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানাই।

ভগিনী নিবেদিতা

১ম পাতার পর

নিয়মিত তাঁর এই বক্তৃতাগুলি বিস্তারিত ছাপা হতে লাগলো। সমগ্র ভারতবাসী স্পষ্ট অনুধাবন করলো দেশের স্বাধীনতার অর্থ দেশবাসী খুঁজে পেলো মুক্তির দিশারী এক দেশপ্রেমিককে, দেশনেত্রীকে।

এমন খবর সংবাদপত্র মারফৎ কলকাতা তথা বেলেড়ো পৌঁছতে বেশি সময় লাগেনি। প্রমাদ গুলেন মঠের সন্ন্যাসীরা। আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন, মনে করলেন মঠের সঙ্গে যুক্ত নিবেদিতার এমন চরমপন্থী কর্মকাণ্ডে মঠের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে উঠতে পারে। বেলেড়ো মঠে নিজেরা বসে সন্ন্যাসীরা তাঁদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঠিক করে ফেললেন।

১৯০৩ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথমদিকে নিবেদিতা কলকাতায় ফিরে এলেন। লেখক গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী একস্থানে লিখছেন : “স্বামী বিবেকানন্দ যেমন একধারে একজন কঠোর তপোনিষ্ঠ যোগী ছিলেন সেই সঙ্গে উগ্র স্বদেশপ্রেমিকও ছিলেন। কিন্তু ইহা তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। সংসার ত্যাগের উপর এই মঠের সবে প্রতিষ্ঠা। এই শিশু মঠের উপর স্বামীজীর উগ্র স্বদেশপ্রেম চাপাইয়া দিলে মঠটি ভাঙ্গিয়া যাইবে। ইংরেজ গভর্নমেন্ট নিবেদিতার উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতাগুলি উপলক্ষ্য করিয়া যদি তাঁহাকে আক্রমণ করে তবে ত এই মঠের ধ্বংস অনিবার্য।”

সূত্রাং, মঠের স্বামী ব্রহ্মানন্দ ডেকে পাঠালেন নিবেদিতাকে। নিবেদিতাকে বললেন, “হয় তুমি রাজনীতি ছেড়ে দাও, নয়ত আমাদের ছেড়ে দাও। মেয়েদের স্কুল পরিচালনা ই তোমার উপযুক্ত কাজ হবে।”

নিবেদিতা বললেন, “আমি রাজনীতি ছাড়তে পারবো না, এদেশের রাজনীতির সঙ্গে আমি একাধ্ব হয়ে গেছি।”

স্বামী ব্রহ্মানন্দ হয়ত এমন বক্তব্য আশা করেননি নিবেদিতার কাছ থেকে। তাই কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, “তাহলে তুমি এক কাজ কর, খোলা চিঠি লিখে কলকাতার সংবাদপত্রগুলিতে জানিয়ে দাও যে, তুমি নিজের ইচ্ছায় মঠ ছেড়ে যাচ্ছ, আমরা তোমাকে তাড়ানি না।”

সূত্রাং নিবেদিতা এর কয়েকদিনের মধ্যে দি স্টেটসম্যান পত্রিকায় সেই চিঠি প্রকাশ করে দিলেন।

এই একটি ঘটনা থেকেই কিন্তু ভগিনী নিবেদিতার জীবনের লক্ষ্য, মানসিক স্বৈর্য,

চারিত্রিক বলিষ্ঠতা, দেশপ্রেম, দেশের মানুষের প্রতি ভালবাসা, স্বাধীনতার অধিকার অর্জনের আকাঙ্ক্ষার দিনগুলি পরিষ্কার হয়ে যায়।

মার্গারেট নোবল-এর জন্ম ২৮ অক্টোবর, ১৮৬৭, উত্তর আয়ারল্যান্ডে। বাবা স্যামুয়েল রিচমন্ড নোবল, মা মেরী ইজাবেল। ছিল আরও এক ভাই রিচমন্ড এবং এক বোন মে। নিজের দেশে তিনি শিক্ষকতা করতেন, স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা হয় ১৫ নভেম্বর, ১৮৯৫ সালে লন্ডনে। মার্গারেট ভারতে এলেন ১৮৯৮ সালে, খিদিরপুরে জাহাজ থেকে নামলেন ২৮ জানুয়ারি। ঐ বছর ২৫ মার্চ স্বামী বিবেকানন্দের উপস্থিতিতে বেলেড়ের নীলাস্বর মুখার্জির বাড়িতে তিনি মার্গারেট নোবল থেকে হলেন ভগিনী নিবেদিতা।

ঐ ১৮৯৮ সালের ১ নভেম্বর থেকে তিনি থাকতে শুরু করলেন উত্তর কলকাতার ১৬ নম্বর বোসপাড়া লেনের বাড়িতে। এই বাড়িতেই ১৩ নভেম্বর থেকে তিনি চালু করলেন বালিকা বিদ্যালয়।

১৯০২ সাল নাগাদ বাংলায় তখন সক্রিয় ছিল বেশ কয়েকটি গুপ্ত সমিতি। সরলা দেবীর গুপ্ত সমিতি, যেখানে লাঠি খেলা, অস্ত্র-পূজা, শরীরচর্চা, দেশপ্রেমের পাঠ দেওয়া হত, কিন্তু এরা গুপ্ত হত্যা বিষাসী ছিল না। মধ্য কলকাতায় ছিল আত্মোন্নতি সমিতি এবং ছিল ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্র প্রতিষ্ঠিত অনুশীলন সমিতি। এসব সংস্থা সম্পর্কে নিবেদিতা ক্রমশ ওয়াকিবহাল হলেন।

১৯০৩ সালেই আমরা দেখেছি গুপ্ত সমিতিতে তাঁর সংগ্রহে থাকা বিপ্লববাদী ১৫০টির মত পুস্তক দান করেছেন। লেখক গিরিজাশঙ্কর লিখছেন :

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে মার্চ মাসে নিবেদিতার বাড়িতেই বারীন্দ্রকুমার ও স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত যুগান্তরের সকল রকম প্ল্যান স্থির করে প্রথম সংখ্যা লিখে ফেললেন।

সূত্রাং যুগান্তরের আড্ডার বৈপ্লবিক পরিকল্পনা ভগিনী নিবেদিতার নেতৃত্ব ও পরামর্শ ব্যতীত আরম্ভ হইল না।”

১৯০৭ সালের আগস্ট মাসে ইংলণ্ডে যাবার আগে নিবেদিতা যুগান্তরের বিপ্লবীদের যে-সব শিক্ষা, নির্দেশ দিয়েছিলেন, তা বিশেষভাবে উল্লেখ্য :

১. সশস্ত্র বিদ্রোহের পরিকল্পনা তৈরি করা
২. গ্রাম এবং শহর উভয় জায়গাতেই গুপ্ত সমিতি গড়ে তোলা এবং
৩. ছোট-বড় সমস্ত গুপ্ত সমিতি গুলিকে একত্রীকরণ করা
৪. নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের ব্যবস্থাগুলিকে উন্নত করা
৫. এই বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে মেয়েদেরকেও সামিল করা

গান্ধী সেবা সংঘ

৭৫ বছরের অনন্য যাত্রা

গৌতম সাহা (পূর্ব প্রকাশিতের পর) নবম পর্ব

গান্ধী সেবা সংঘের ইতিহাসে ১৯৮১ থেকে ১৯৮৪ এক অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এই সময়কালেই গড়ে ওঠে প্রতিষ্ঠান নিজস্ব ৩০০০ স্কয়ারফিটের বেশি এলাকা নিয়ে নিজস্ব ভবন। স্কুলের বাড়ি তৈরি হওয়ার পরে এই তিন হাজার স্কয়ার ফিটের ভবনকে ভিত্তি করেই সঙ্গ একের পর এক জনকল্যাণকর প্রকল্পগুলি বাস্তবে বাস্তবায়িত করেছে। সেদিনের সেই সাদামাটা একতলার বাড়ি এখন পূর্ণাঙ্গ রূপ পেয়েছে। এখন ফিরে দেখা যাক সেই বছরগুলিতে কি ধরনের কাজ হয়েছিল আর তারাই বা অসীম আগ্রহ নিয়ে সেই মানুষ অনেকজনের অনেকেই আজ আমাদের মাঝে নেই কিন্তু আর তাদের সেই স্বপ্ন সাধনা আন্তরিক প্রচেষ্টা ও স্বেচ্ছাশ্রম কিছুই বিফলে যায়নি। পথ চলা শুরু আট দশক পরেও গান্ধী সেবা সংঘ এখনো নবীন এখনো প্রাণ চঞ্চল এখন এখন আরো বেশি সজিব ও শক্তিশালী হয়ে নিঃস্বার্থ সমাজ সেবায় নিমগ্ন আছে

এবার ফিরে যাওয়া যাক সেই আশি দশকের গোড়ার দিকগুলোতে ১৯৮২ তখন শুধুমাত্র বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের অসম্পূর্ণ ছোট্ট দোতলা বাড়ি সেখানেই বিদ্যালয়ের সাথে সাথে চলছে সেলাই শেখার ট্রেনিং বয়স্ক নাগরিকদের জন্য সাক্ষরতা অভিযান দাতব্য হোমিও চিকিৎসালয় সন্ধ্যায় সাদা কাপড়ী সমিতির মিটিং। সেই মিটিংগুলোতে সাগ্রহে যোগ দিতেন কার্যকরী সদস্যদের ছাড়াও এলাকার অনেক উৎসাহী মানুষজন কাজের ফিরতি দায়ের শুরুতেই মনে করে নেয়া যাক ১৯৮১ থেকে ১৯৮৪ এই সময়ের সক্রিয় কিছু সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবীদের নাম।

সেই সময়ে অত্যন্ত সক্রিয় মানিক্যতন গোষ্ঠাকুরতার হাত ধরে হাতে হাত মিলিয়ে এর পর ৩ এর পাতায়...

৬. রাজদ্রোহমূলক কাগজগুলি গোপনে স্কুলের মধ্যে বিতরণ করা
 ৭. ইংরেজ সৈন্যরা, গ্রামে ধাওয়া করলে বিপ্লবীরা জঙ্গলে আশ্রয় নেবে। এঁদের রক্ষা করবে গ্রামবাসীরাই।
 ৮. মৃত্যুভয় জয় করার সংকল্প নিতে হবে। আর এসবের জন্য নিবেদিতা তাঁর হাতে থাকা সমস্ত অর্থ বারীন্দ্রের হাত মারফৎ গ্রামে গ্রামে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করলেন।
 - এবার বলি, বিপ্লবীদের ব্যবহৃত বোমা তৈরির গোড়ার কথা। এখানেও নিবেদিতা সক্রিয়। সেটা ঐ ১৯০৭ সাল।
 - যে-নিবেদিতা শিল্পসংস্কৃতির পূজারী, সেই তিনিই আবার বিপ্লবীদের জন্য এদেশে বোমা তৈরির ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিলেন। আসলে তাঁর বিপ্লব-গুরু ক্রোপাটকিন-এর কাছ থেকে যে নিবেদিতা নিজেই বোমা তৈরির কলাকৌশল শিখেছিলেন। হোমচন্দ্র দাসকে পাঠানো হয়েছে ইতিবসরে প্যারিসে বোমা তৈরির কৌশল শিখতে। তিনি তখনও দেশে ফেরেননি। বারীন্দ্র এবং উল্লাসকর দত্ত অধৈর্য হয়ে উঠলেন। ইতিমধ্যে উল্লাসকর দত্ত খানিকটা তাঁর নিজের চেষ্টাতেই বোমা তৈরির ফর্মুলা আবিষ্কার করে ফেললেন। একথা নিবেদিতাকে জানানো হল। নিবেদিতা তাঁর অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন অগ্রজ বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর কাছে এই ফর্মুলার কার্যকারিতা প্রমাণ করতে দুজনকে নিয়ে গেলেন। আচার্য বসু এঁদেরকে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কাছে পাঠালেন। হ্যাঁ, প্রফুল্লচন্দ্র রায় নিবেদিতার এই অনুরোধে সাজ দিলেন। তারপর আচার্য রায়ের গবেষণাগারে নিয়মিত চলতে লাগলো পরীক্ষা নিরীক্ষা বোমা তৈরির ফর্মুলাগুলিকে নিয়ে।
 - মৃত্যুর আগে পর্যন্ত সে-যুগের বহু বিপ্লবী থেকে মনীষীদের সঙ্গে নিবেদিতার
- সখ্যতা ছিল।
- শংকরীপ্রসাদ বসু লিখেছেন :
- তিনি কোন স্বদেশী ডাকতি বা বৈপ্লবিক হত্যাকাণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায়নি।
- ক্ষতিকর কোনো ব্যক্তিকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়াকে তিনি দোষ মনে করতেন না। কিন্তু বিবেচনাহীন হত্যাকাণ্ডকে করতেন না।
- তিনি স্বদেশী দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পুলিশমহল তাঁকে স্বদেশী ডাকতির নেত্রী বলে মনে করতো।
- গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য তিনি কখনও ছদ্মবেশ ধারণ করেছেন, কখনও ভারত ত্যাগ করেছেন, কখনও ভারতেই ফরাসি উপনিবেশে আশ্রয় নিয়েছেন।
- গোপন প্রেসে বৈপ্লবিক বক্তব্য ছাপানোতে উৎসাহী ছিলেন।
- বিশেষ থেকে অস্ত্রস্ত্র আমদানীতেও সন্তুষ্ট তাঁর হাত ছিল।
- তাঁর নিজস্ব দল ছিল এ-ব্যাপারে।
- উচ্চমহলে তাঁর যোগাযোগ ছিল—
- নানা স্থানে তাঁর চর থাকতো।
- তিনি অবশ্যই ক্ষুরধার রাজনৈতিক বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন।
- ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানেত্রী এই মহীয়সী নারী ভগিনী নিবেদিতার জীবনাবসান ঘটে যায় দার্জিলিং ১৯১১ সালের ১৩ অক্টোবর।
- তথ্যসূত্র :**
১. ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ—গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী
 ২. নিবেদিতা লোকমাতা, ২য় খণ্ড, শঙ্করীপ্রসাদ বসু
 ৩. ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ - পৃ. ৪০

সেবানিবাস সংবাদ

মধুমিতা মোদক

প্রতিবছরের মত এবছরেও পয়লা জুন গান্ধী সেবা সংঘের ফিজিওথেরাপিস্ট অরিন্দম মুখার্জী তার ছেলের জন্মদিন উপলক্ষে সোমবারের আড্ডায় সেবা নিবাসের সকলের জন্য সরবত ও সান্ধ্য জলখাবারের আয়োজন করেন।

Cotality সংস্থা তাদের কোম্পানির থ্যাঙ্কস গিভিং ডে উপলক্ষে প্রতি বছর সেবানিবাসী সকল রোগীদের জন্য চাল আটা ডাল তেল বিস্কুট মিষ্টিসহ অন্যান্য উপহার সামগ্রী নিয়ে আসেন। এ বছরও তেসরা জুন সংস্থার প্রায় ৭০-৮০ জন কর্মী, তাদের ইন্ডিয়া ইউনিট প্রধান দিব্যদুর্কিশোর গোস্বামী, যিনি সংঘেরও কার্যনির্বাহী সদস্য এবং বিভাগীয় এইচআর প্রধান মানিক্য মশে উপস্থিত হন। উপস্থিত ছিলেন সেবা নিবাসের রোগী ও তাদের পরিজনবর্গ। সেদিন অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব সাগ্রহে বহন করেছেন ১ নম্বর ঘরের রোগীর পরিজন শবনম ও ৯ নম্বর ঘরের দিলকর্ণা। তাদের স্বতঃস্ফূর্ত আলাপচারিতায় সকলেই মুগ্ধ হন। বসন্ত বাড়ির নামক একজন রোগী দক্ষতার সঙ্গে লোকসংগীত পরিবেশন করেন, ইয়ারকল বিবি সুন্দর বক্তব্য রাখেন, গানও শোনান। Cotalityর পক্ষ থেকে দিব্যদুর্কিশোর গোস্বামী এবং সংঘের পক্ষ থেকে সুপ্রিয় দাস কিছুকথা বলেন এবং Cotalityর বেশ কিছু কর্মী গান ও কবিতা পরিবেশন করে সকলকে আনন্দ দেন। খাদ্যসামগ্রী ও উপহার মিলে প্রতিটি রোগীর হাতে প্রায় ২০০০ টাকার সামগ্রী তারা তুলে দেন।

অমল আলোয় সংস্থা, মধ্যমগ্রাম প্রতিমাসেই সেবানিবাসে বিতরণের জন্য এক বস্তা চাল ও ডিম দান করে। ২৭শে জুন তাদের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে দুপুরে প্রায় কুড়ি জন সদস্য সেবানিবাসে আসেন, কেঁক কাটা হয়, গান, গল্প, কেঁক, মিষ্টি এবং সকলের জন্য দুপুরের



খাবার এবং rylestube রোগীদের জন্য তারা ছাতু দুধ ও ডিমের ব্যবস্থা রেখেছিলেন। জুন, জুলাই ও আগস্ট মাসে বহু সুধীজন সেবানিবাসে আসেন এবং রোগীদের জন্য চাল, চিনি, ছাতু, সুজি, ডাল, তেল, আটা, চা, বিস্কুট, সাবান এবং জামাকাপড় প্রদান করেছেন। উল্লেখ করা যেতে পারে তরুণ আগারওয়াল মিস্টার বনশাল, বিকাশপুরি কৈখালী থেকে একটি দল, কবিতার স্বরলিপি, বাণ্ডুইআটি, সংঘ সদস্য প্রশান্ত কুন্ডু প্রমুখের নাম।

শ্রীমতি ইন্দ্রানী দত্ত এবং শ্রীমতি সর্বানি দেওয়ানজী ১৬ই জুলাই সেবানিবাসে শ্রী দিওয়ানজীর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে রোগী ও পরিজনদের জন্য রাতের খাবারের আয়োজন করেন। সীতারাম গোস্বামী তার কন্যার জন্মদিনে সকলের জন্য রাতের খাবারের এবং শংকর চক্রবর্তী তার বাবার প্রয়াণ দিবসে মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করেন।

৬ই আগস্ট মধ্যমগ্রামের মৌ সাহা ও মান্ডু পোদ্দার। তারা তাদের প্রয়াত পিতা-মাতার স্মরণে একটি অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর সংঘকে দান করেন।

আপনারা আগের সংখ্যায় জেনেছেন লেকটাউনের চৈতালী দত্ত ও তার পুত্র সৈকত দত্ত একটি আছড়া এমপ্লিফায়ার, পাঁচটি টাওয়ারস্পিকার এবং একটি কর্ডলেস মাউথ পিস সেবানিবাসে দান করেছেন। সেগুলির ইনস্টলেশনের পর ৩১শে আগস্ট থেকে দোতলা, তিনতলা, চারতলাবাসী সকল রোগীদের কাছে বার্তা পৌঁছে দেওয়া এবং সকল আটটা থেকে রাত্রি আটটা অবধি সেবানিবাসে যন্ত্রসংগীত ও লঘুসঙ্গীত বাজানোর ব্যবস্থা শুরু হয়েছে।

শিক্ষকতার সঙ্কট

AI কি আলাদিনের জিন

AI (Artificial Intelligence) কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কয়েকজন প্রতিভাবান মানুষের ও ধনবান শিল্পপতির উদ্যোগে বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ। কিন্তু তার ব্যবহারিক প্রয়োগ সর্বজনীন বিশ্বময় এবং সুদূর প্রসারী। পৃথিবীর যাবতীয় প্রকাশিত তথ্য ও তথ্য এতাই মুহূর্তের মধ্যে তার অনন্ত অসীম ভান্ডার থেকে খুঁজে এনে প্রশ্নকারীর হাতে তুলে দিচ্ছে। কোথায় লাগে আলাদিনের জিন? বালক-বৃদ্ধ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, বুদ্ধিমান নির্বোধ ভালো-মন্দ কোন বাদ বিচার নেই। ছকুম করলেই তথ্য ও তত্ত্ব হাজির। শুধু তাই নয় ঠিক যে রকম ভাবে আপনি চাইছেন—লেখায়, ছবিতে, জাইডে, রিপোর্টে—এতাই আপনাকে ঠিক তেমন ভাবেই তথ্য পরিবেশন করবে। এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই। আপনাকে বই খুঁজতে হবে না, কাঁড়ে কিছু জিজ্ঞেস করতে হবে না, কোন কিছু ভাবতে হবে না। আপনি রাশিয়ান বা জার্মান বা চীনা বা জাপানি ভাষা জানেন না। কোন সমস্যা নেই। আপনি ছবি তুলে এতাই বাবাকে বলুন—সাধারণ ইংরেজি বা বাংলায় ওই রিপোর্ট বা তথ্য অনুবাদ করে দিতে। সঙ্গে সঙ্গে আপনি প্রয়োজনীয় তথ্য পেয়ে যাবেন। রক্ত পরীক্ষা বা এক্সরে বা অন্য কোন ডাক্তারি পরীক্ষা রিপোর্ট বুঝতে পারছেন না এতাই বাবাকে এই ছবি তুলে পাঠিয়ে দেবেন। কাজ চলতি সহজ ভাষায় রিপোর্টের মূল বক্তব্য আপনি পেয়ে যাবেন।

অনিবার্য পরিণতি

অল্প বয়সেই স্কুল বা কলেজের ছেলে মেয়েরা এই আলাদিনের দিনের চেয়েও বহুগুণ শক্তিশালী জিনের সন্ধান পেয়ে গেছে। তাদের আর কষ্ট করে কোন কিছু জানার জন্য, পড়াশোনা করার বা সুন্দর করে পরিবেশন

১ম পাতার পর

করার জন্য পরিশ্রমের প্রয়োজন নেই। তথ্য এবং তত্ত্ব হাতে আসার পর সেগুলিকে মনে রাখারও প্রয়োজন নেই। যাওয়া মাত্রই তো আবার পেয়ে যাব। এর ফল কি হচ্ছে? ছেলেমেয়েরা মনোযোগ দিয়ে কোন কিছু শেখার বা জানার জন্য আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। সব বিষয়ে। মনে রাখার চেষ্টা অনেক কমে গেছে। নেহাত পরীক্ষার সময় এ আই এর পাঠানো তথ্য ও তথ্য মুঠো ফোন ব্যবহার করা যায় না। তাই পরীক্ষার সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তরগুলো কোনরকমে কণ্ঠস্বর করে পরীক্ষার খাতার উগড়ে দিচ্ছে—হৃদয়দম করছে না। অনিবার্য ফলস্বরূপ নিজস্ব চিন্তা করার, নিজে কিছু ভেবে যুক্তি সহযোগে সমাধান করার কোন অভ্যাস তৈরি হচ্ছে না। এতাই—সর্বশ্র, এতাই—নির্ভর মানুষ-রোবট তৈরি হচ্ছে। কোন কারণে যদি এতাই বন্ধ করা হয়, এই ছাত্র-রোবট জড়বুদ্ধি সম্পন্ন অসহায় মানুষে পরিণত হবে। আর এতাই নিয়ন্ত্রণকারী কতিপয় মানুষের নির্বোধ ক্রীতদাস হয়ে যাবে।

বাঁচার উপায়

ছাত্রদের এই ভয়ঙ্কর পরিণতির হাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা শিক্ষকদের করতে হবে। তথ্য ও তত্ত্ব নির্ভর শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তে যুক্তি ও বিশ্লেষণ নির্ভর শিক্ষা পদ্ধতি চালু করতে হবে। হাতে কলমে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার অভ্যাস করাতে হবে। প্রশ্ন করতে, চিন্তা করতে শেখাতে হবে। প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হওয়ার কর্মসূচি পালন করাতে হবে। পরীক্ষা ব্যবস্থারও আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। আর এই সমস্ত পরিবর্তনের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষকদের অনেক বেশি মনন চিন্তন অনুশীলন ও পরিশ্রম করতে হবে। শিক্ষার এই ভয়াবহ সঙ্কট থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় খুঁজে পাওয়াই এখন শিক্ষকদের সঙ্কট।

৭৫ বছরের অনন্য যাত্রা

২য় পাতার পর

কাজ করেছেন অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র দত্ত প্রখ্যাত ব্যবসায়ী গৌরান্দ্রচন্দ্র বণিক অশোক কুমার সেন উদ্যোগপতি অধীর কুমার বোস, দীপ্তি ব্যানার্জি বিনয় কুমার ঘোষ সুধীন মুখার্জি সমর গান্ধুলী সুনীল কুমার পালিত গৌতম সাহা আশিস গান্ধুলী শ্রীকান্ত রায়চৌধুরী সুনীল পালিত মেজর ভাদুড়ি জে এস বচোয়াত, কল্যাণী সেনগুপ্ত অসীম চ্যাটার্জী আর কে দাস রবীন্দ্রনাথ মুখার্জি রণজিত চ্যাটার্জী অধীর বোস গৌরীপ্রসাদ সেন, নির্মল চক্রবর্তীর রনলাল ঘোষ দত্তিদার, সুব্রত ভট্টাচার্য মধুসূদন ব্যানার্জি অরবিন্দ পোদ্দার গণেশ চন্দ্র ব্যানার্জি নৃপেন্দ্রলাল দত্ত, দীপ্তি ব্যানার্জি, এনসি পাল, আর কে দাস, সন্তোষ নসিপুরি, সন্তোষ রঞ্জন সাহা, প্রসন্নকুমার রায়, তুলসী মুখার্জী সহ সমাজের সব স্তরের বেশ কিছু উৎসাহী কর্মঠ সদস্য-সদস্যা, শুভানুধ্যায়ী, পরিচালক, পরামর্শদাতা ও উদার হস্ত দাতা। লেকটাউনে বাস করতেন বেশ কয়েকজন রাজ্য সরকারের সর্বোচ্চস্তরের আধিকারীক। এদের মধ্যে বেশ কয়েকজন, যেমন বি, আর, গুপ্ত, অমিয় সেন, প্রসাদ বোস সহ কয়েকজন আন্তরিক ভাবেই গান্ধী সেবা সংঘের কাজে আকৃষ্ট হন ও যথাসাধ্য সাহায্য করেন। এছাড়া, সংঘের প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই কলকাতার একটা খুব বিখ্যাত দাঁ, দত্ত, লাহা, বণিক পরিবার গান্ধী সেবা সংঘ কে তাদের একান্ত আপন বলে মেনে নিয়েছেন, মনে করেছেন, আর সেই মতো কাজও করে গেছেন। ১৯৮২তে সঙ্ঘ ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে ধনকুবের গৌরান্দ্র চন্দ্র বণিকের উৎসাহ ছিল চোখে পরার মতো।

এছাড়া গান্ধী সেবা সংঘের প্রথম থেকেই যারা সব বিষয়ে সমর্থন আর সাহায্য করে এসেছেন তারা হলেন কলকাতার বিখ্যাত ব্যবসায়ী পরিবারগুলি যেমন দাঁ পরিবার, দত্ত পরিবার, লাহা এবং বণিক পরিবার।

১৯৮২ সালের মাঝামাঝি প্রয়াত হলেন বিশিষ্ট গান্ধীবাদী গান্ধী সভা সংঘের প্রেরণা স্বরূপ শ্রী আশুতোষ চ্যাটার্জী। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সাআশে জুন সেক্রেটারি মানিকবাবু বাড়িতে বিশেষ স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়েছিল।

দাতব্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা কেন্দ্রটি চাহিদা ক্রমেই বাড়ছিল স্বাভাবিকভাবেই খরচা বেড়ে যাচ্ছে মাসে প্রায়ই আড়াইশো টাকা ঘাটতি হচ্ছে। অতএব উপায়ে সঙ্গে তৎকালীন সহ সভাপতি মেজর ভাদুড়ীর নেতৃত্বে সবাই এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্যদের ঘাটতির কিছুটা অন্তত পূর্ণ করার জন্য মাসে পাঁচ টাকা করে দানের অনুরোধ জানানো হলো। কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় মহিলা শিলাই শেখার কেন্দ্রটি ভালই চলছে। সরকারের কাছে ট্রেনিং ক্লাস টি আরো এক বছরের জন্য অন্তত বাড়ানো যাতে যায় তার অনুরোধ জানানো হলো। স্কুল পরিচালনা ছাড়া গান দিয়ে সেবা সংঘের যত কিছু কাজকর্ম চালানোর একটি জায়গা সেই অর্থ সমাপ্ত স্কুল বাড়ি। এভাবে চলা বড় মুশকিল সঙ্গে নিজস্ব বাড়ি তৈরির সিদ্ধান্ত আগেই নেয়া হয়েছে কিন্তু ভাবাই সার টাকা কোথায়? দাবি উঠলো ওই জমিতে এখনই অন্তত একটি ঘর তৈরি করে সংঘের কাজ চালানো হোক সেপ্টেম্বরে নোটিশ দেয়া হলো ২রা অক্টোবর ১৯৮২ শনিবার সকালে নতুন বাড়ির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হবে। ঠিক হলো এদিন ডক্টর বি. কে ভট্টাচার্য রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্য সচিব অমীয়া কুমার সেন ও অন্য কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিককে ওই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হবে। কিন্তু তার আগেই ভারত বিখ্যাত শিক্ষাবিদ গান্ধী সেবা সংঘের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ও শুভানুধ্যায়ী ডক্টর বি কে ভট্টাচার্য চির বিদায় নিলেন।

নির্ধারিত দিন অর্থাৎ ২রা অক্টোবর ১৯৮২ তে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হলো। শ্রী অমিয় সেন, শ্রী গৌরান্দ্র বণিক, শর মাণিক্য রতন গুহ ঠাকুরতা ও আরো অনেকের উপস্থিতিতে গান্ধী সেবা সংঘের নতুন বাড়ির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনা হলো।

ভিত্তি প্রস্তুত তো স্থাপনা করা হলো কিন্তু তারপর বাড়ি হবে এদিকে ভাবে মা ভবানী, প্রাক্তন নাই যে প্রসাদ বসুর বাড়িতে এক মিটিংয়ে সমর গানগুলি আর সুদিন মুখার্জীকে দায়িত্ব দেয়া হলো জয়া সিনেমা হলে একটি চারিটি শো করে টাকা সংগ্রহ করার জন্য। আরো ঘোষনা হলো যে এক হাজার টাকা বা তার বেশি অংকের দাতাদের নাম শ্বেত পাথরের ফলাকে লেখা হবে।

মেজর ইন ভাদুড়ীর সভাপতিত্বে সংঘের ৩৬ তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হলো ১৯৮২ সালের ২৬শে ডিসেম্বর, মাত্র কুড়ি জন সদস্য তাতে যোগ দিলেন। (ক্রমশঃ)

মার্কিন-ইরান যুদ্ধ, ২০২৬ : অনুসন্ধিৎসু বীক্ষণ

কল্যাণ কুমার সরকার

‘স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাতে, লোভে লোভে ঘটেছে সংগ্রাম’

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কথামুখ : স্বার্থ, স্বার্থ, স্বার্থ! স্বার্থের জন্যই বেধেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইরানের সংঘাত, সংঘর্ষ,— প্রত্যক্ষ যুদ্ধ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ হল মধ্যপ্রাচ্যের তেলসমৃদ্ধ ইরানের তেল ভাণ্ডারগুলিকে দখল করে অপরিমেয় তেল আত্মসাৎ করা এবং তেল শিরোমণি হয়ে তৈলের চাহিদাসম্পন্ন পৃথিবীর উপর একচেটিয়া ভাবে দাঙ্গাগিরি করা, মধ্যপ্রাচ্যের উপর তো বটেই।

এমনিতেই বর্তমান পৃথিবী হল একমেরুপ্রবণ। সেই মেরু বা স্তম্ভই (pole) হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এমতাবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা-রাজনীতির (power politics) ক্ষমতাধর রাষ্ট্রপতি মি. ডোনাল্ড ট্রাম্প তো এককদম এগিয়েই আছেন। কীভাবে নিজেকে বিশ্ব-রাজনীতির পরিত্রাতা ব্যক্তিত্বে পরিণত করা যায়, সেই স্বার্থ তো তাঁর আছেই, সঙ্গে রয়েছে তেলসমৃদ্ধ সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যের সাথে সাথে সমগ্র বিশ্বের উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দাঙ্গাগিরি, বিশেষ করে নিজের দাঙ্গাগিরিকে প্রতিষ্ঠিত করা।

অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্যের প্রভাবশালী আক্রান্ত রাষ্ট্র ইরানও তার নিজের যথাসাধ্য শক্তি দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়া আধাঙ্গন ও আক্রমণকে প্রতিহত করে চলেছে। আর তাইতো আঘাত-প্রত্যাঘাতে বেধে গিয়েছে এক মারণ সংঘাত। এই সংঘাতে ইরানের স্বার্থ হল মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে নিজেকে অবিসংবাদী নেতাতে পরিণত করা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এই যুদ্ধে যথাসাধ্য রুখে দিয়ে তেল দুনিয়ায় নিজের অপ্রতিহত প্রাধান্যকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং বিশ্ব রাজনীতির আসরে নিজেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শত্রু প্রতিপক্ষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা এবং এমনকী তার মাধ্যমে বিশ্বরাজনীতির কর্মকর্তা বা খেলোয়ার (Actor) হিসাবে নিজেকে সূত্রীভূত করা। মূলত মধ্যপ্রাচ্যে, বিশেষ করে পারস্য উপসাগরের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলি যথা সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত (UAE), ইরাক, ওমান, বাহরিন প্রভৃতি রাষ্ট্রের উপর অবিসংবাদী রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করাটাও ছিল মার্কিন-ইরান যুদ্ধে (২০২৬) ইরানের অন্যতম উদ্দেশ্য।

যুদ্ধটির উৎস :

সমকালীন সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছিল ইরানের পারমাণবিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা, তেলসমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের আঞ্চলিক প্রভাব বিস্তারের বাসনা, পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে ইরানের একচ্ছত্র প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার নিবিড় প্রয়াস, ইরানের পারমাণবিক শক্তিকে কেন্দ্র করে তেলভাণ্ডারগুলিকে দখল করার বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদগ্র আকাঙ্ক্ষা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুকৌশলী নিষেধাজ্ঞা ও নিয়ন্ত্রণ নীতির (Sanctions and containment Policy-এর) সক্রিয়তা।

যুদ্ধটির অন্যতম অভিমুখ :

সাম্প্রতিককালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইরানের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিকচিহ্ন হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরান এবং বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের মধ্যে ২০১৫ সালে সম্পাদিত ‘যৌথ সামগ্রিক পরিকল্পনা’ বা ‘Joint Comprehensive Plan of Action’ (JCPOA), যেটি ইরান পারমাণবিক চুক্তি বা ইরান ডিল (Iran Deal) নামেই পরিচিত। এই আন্তর্জাতিক চুক্তিটির মূল উদ্দেশ্যই ছিল ইরানের পারমাণবিক সক্ষমতাকে হ্রাস করা। শর্তের বিনিময়ে তার উপর থেকে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞাকে প্রত্যাহার করা। তবে ২০১৮ সালে মি. ডোনাল্ড ট্রাম্পের মার্কিন প্রশাসন এই চুক্তি (JCPOA) থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বের করে আনেন এবং ইরানের উপর নতুন করে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা বা অবরোধ আরোপ করেন। ইরানও অবশ্য পরবর্তীকালে এই চুক্তির (JCPOA) শর্তসমূহকে মান্য করা থেকে সরে এসে পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণের কাজে নিয়োজিত হয়। এতেই রীতিমতো জ্বুদ হয়ে ওঠেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি মি. ডোনাল্ড ট্রাম্প। এরই ফলে ২০২০ সালের এক মার্কিন আক্রমণে মার্কিন সেনাদের হাতে ইরানীয় শাসক প্রধান জেনারেল কাসেম সোলেই মানি নির্মম ভাবে নিহত হন, যা স্বাভাবিকভাবেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানকে প্রকাশ্য দ্বন্দ্বের মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়।

প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব থেকে প্রত্যক্ষ যুদ্ধ :

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যকার এই প্রকাশ্য দ্বন্দ্বটি তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে নানা ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে, যথা— পারমাণবিক শক্তি সম্প্রসারণজনিত ইরানীয় উদ্যোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বোধ, মধ্যপ্রাচ্যের আঞ্চলিক পরিসরে সিরিয়া, ইরাক, ইয়েমেনে প্রভৃতি রাষ্ট্রের উপর ইরানের ছদ্ম আক্রমণ (Proxy Attack), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক (ইরানের) সাধারণ জনগণের স্বার্থ ক্ষুণ্ণকারী অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ, মূলত নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বিদ্যুৎ, তেল, গ্যাস ইত্যাদি জ্বালানির প্রাপ্যতার সুনিশ্চিতকরণের (Energy Security) বিষয়ে মার্কিনী উদ্যোগ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক তেল প্রভৃতির বিশ্ব বাণিজ্যের প্রসার সাধন ইত্যাদি।

২০২৫ সালে মার্কিন রাষ্ট্রপতি হিসাবে মি. ডোনাল্ড ট্রাম্পের পুনর্নির্বাচন এবং রাষ্ট্রপতি হিসাবে তাঁর দ্বিতীয়বারের জন্য শপথ গ্রহণের ঘটনাটিই ইরানকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক আক্রমণের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত করে দেয়, যা ২০২৬ সালের সূচনা পর্বে বৈশ্বিক জ্বালানির নিরাপত্তার ব্যবস্থাপনাকে (Global Energy Security Dynamics-কে) রীতিমতো জটিলতর করে তোলে এবং এর অবস্থান্যবী পরিণতিতেই মি. ডোনাল্ড ট্রাম্পের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২০২৬ সালের ২৮ শে ফেব্রুয়ারি

মানিক্য মঞ্চে সংঘের অনুষ্ঠান

মধুমিতা মোদক



গত ২৬শে জুলাই, ২০২৬, সকাল ১১টায় মানিক্য মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল গান্ধী সেবা সংঘের ৭৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা। সভাপতিত্ব করেন সংঘের সভাপতি শ্রী হিরণ্ময় সাহা। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সহ-সভাপতি শ্রী গৌতম দে, সহ-সভাপতি শ্রী সনৎ সাহা, সহ-সভাপতি শ্রী উৎপল ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক গৌতম সাহা ও কোষাধ্যক্ষ শ্রী বিবেকানন্দ ঘোষ।

কার্যবিবরণী পাঠের পূর্বে সম্পাদক গত এক বছরে প্রয়াত প্রাক্তন সদস্য শ্রী শ্যামল ঘোষ সহ অন্যান্য প্রয়াত শুভানুধ্যায়ীদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালনের প্রস্তাব দেন। সম্পাদক ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে সংঘের কার্যকলাপ এবং ২০২৬-২৭ সালের প্রস্তাবিত কর্মপরিকল্পনার ওপর প্রতিবেদন পেশ করেন। কোষাধ্যক্ষ শ্রী বিবেকানন্দ ঘোষ ২০২৫-২৬ সালের নিরীক্ষিত হিসাব পেশ করেন। তিনি বার্ষিক সদস্যপদ ফি ২০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫০০ টাকা এবং আজীবন সদস্যপদ ফি ৩০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫০০০ টাকা করার প্রস্তাব দেন। আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয় যে, এই বর্ষিত ফি ০১/০৪/২০২৬ থেকে কার্যকর হবে। কোষাধ্যক্ষ বর্তমান নিরীক্ষক সংস্থা মেসার্স MAKDB & Associates কে ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের জন্যও বহাল রাখার প্রস্তাব দেন, যা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সহ-সভাপতি শ্রী গৌতম দে জানান প্রবীণ নাগরিকদের জন্য অনুষ্ঠান ‘উত্তর’ এর পাশাপাশি বয়স্কদের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য পরিকল্পনা এবং তরুণ প্রজন্মের মোবাইল আসক্তি কাটানোর বিষয়ে অনুষ্ঠান করার প্রয়োজন রয়েছে। স্থল ছাত্রদের দিয়ে বুকরোপণ, বৃত্তি প্রদান ইত্যাদি কাজ করা যেতে পারে।

সংঘ সদস্য শ্রী সমর গাঙ্গুলী ও শ্রীমতী গীতা মুখার্জী যথাক্রমে ১০,০০০ টাকা ও ৫,০০০ টাকা অনুদান প্রদান করেন। স্থানীয় অধিবাসী শ্রী গোপাল পাল তাঁর পুত্র শ্রী ময়াক্ষ পালের জন্মদিন উপলক্ষে সেবানিবাসের রোগীদের জন্য ৩৬ কেজি চাল দান করেন।

সবশেষে সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

তারিখে ইরানের উপর অতর্কিত বৈমানিক আক্রমণ করে বসে এবং মার্কিন-ইসরাইলের এই বিমান হানায় ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লা আলি সোমেইনি (১৯৩৯-২০৬) নিহত হন। শুধু এই-ই নয়, সঙ্গে মার্কিন-ইসরাইল বাহিনীর মুহুমুহু আক্রমণে ইরানের পরিকাঠামোগত ব্যবস্থাপনা রীতিমতো বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে।

ইরানও কিন্তু আক্রান্ত হয়েও নীরব দর্শক হয়ে বসে থাকল না। সেও এবার প্রত্যাঘাতে রীতিমতো মেতে উঠল। আর এই লক্ষ্যে সে ক্রমবর্ধিত হারে দ্রোণ হামলা চালাতে লাগল। তেল সমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধু ও অনুগত রাষ্ট্রগুলিতে ক্রমাগত আক্রমণ চালিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ছদ্ম যুদ্ধ (Proxy War) চালাতে লাগল (অনেকটাই বেন-বি-কে বকে-বো-কে শিক্ষা দেওয়া। বিশ্বজুড়ে তেল রপ্তানি ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ, তেল ও গ্যাসভিত্তিক জ্বালানি ব্যবস্থাকে গোটা বিশ্বে দারুণভাবে বিপর্যস্ত করে দিল। এবং বিশ্ব জুড়ে জ্বালানি সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি হল। ঘরে

ঘরে রাম্মার গ্যাসের সঙ্কটজনিত দুর্ভাবনাকে ছড়িয়ে দিল।

আর ইরানের এই সব প্রত্যাঘাতমূলক ব্যবস্থাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বিশেষ করে মি. ডোনাল্ড ট্রাম্প রীতিমতো ক্ষুব্ধ থেকে ক্ষুব্ধতর হয়ে উঠতে লাগলেন। ফলে আবার হুকার ‘যুদ্ধ’, ‘যুদ্ধ’, ‘যুদ্ধ’— আরও যুদ্ধ— আবারও যুদ্ধ। মার্কিনী যুদ্ধে হয়ত বিক্ষুব্ধ ইরানও দমে যাওয়ার পাত্র ছিল না।

আমাদের অনুভব :

সূত্রায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ২০২৬ সালের প্রথম লগ্নের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বনাম ইরানের যুদ্ধটা সমগ্র বিশ্বে কিন্তু রীতিমতো আতঙ্কিত করে তুলেছিল। বস্তুত রাষ্ট্রসংঘের সনদের (The Charter of UNO) নিয়মবিধির কারণে বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা (বর্তমানে) প্রায় বিলুপ্ত হলেও স্থানীয় যুদ্ধের (Local War) সম্ভাবনা কিন্তু সর্বদাই থেকে গিয়েছে। আর এরই ফলশ্রুতি হল ২০২৬ সালের এই মার্কিন-ইরান যুদ্ধ। তবে একথা অনিবার্য সত্য যে, পৃথিবী শান্তি চায়, পৃথিবীর মানুষ শান্তির জন্য রীতিমতো উন্মুখ।

আমোদে আল্লাদে — রথের টানে

তপতী গাঙ্গুলি



পাতিপুকুর অঞ্চলে রয়েছে আদ্যনাথ সাহা রোড। ‘আদ্য’ কথার অর্থ আদি। আদি প্রভুর নামের এই পথেই পাশে শ্রী শ্রী বাসুদেব জীউ মন্দির। বাসুদেব এখানে নারায়ণরূপী, দুপাশে লক্ষ্মী ও সরস্বতী। ধাতব একচালি মূর্তি। আজ ৩১শে আষাঢ় তিনি আজ স্রাং অঞ্চল পরিভ্রমণ করে বের হবেন এই দিনটি পঞ্জিকাতে পূর্ব নির্ধারিত। মন্দিরের মূল ফটকে তাঁর যাত্রা করার সুসজ্জিত বাহন গাড়ি তৈরী। আমরা একেই বলি ‘রথ’। আর আনুষ্ঠানিক যাত্রাটি রথ যাত্রা। প্রভুর চলার পথ, গাছগাছালি আষাঢ়ের বৃষ্টি ধারায় ধুয়ে মুছে সাফ। রথে ‘তিনি’। বেল, ঝুঁই ফুলের সুবাসে, চন্দনতিলকে সজ্জিত। এলাকবাসী রথের দড়ি টেনে প্রভুকে এগিয়ে নিতে অপেক্ষাকৃত পথ নির্দেশনায় মূল পুরোহিত শঙ্করদা, গৌতমদা, রয়েছে মন্দির কমিটির স্বচ্ছসেবকবাহিনী। উচ্চশব্দ ধ্বনি উঠল, রথ এগোতে থাকল। এ এক আটপৌরে সৃষ্টিশীলতার শোভাযাত্রা, রথ সম্মুখে দুবাচ্চ উচিয়ে স্থায়ী গোড়িনিতাই, খোঁপায় ফুল নিয়ে ওড়িশী নৃত্যরত কিশোরীরা, হলদে পোশাকে সারিবদ্ধ পুণ্যকামী নরনারী, সাজগোজ সীমাহীন। পরিভ্রমণে সেরে রথ ফিরল মন্দির প্রবেশদ্বারে।

ছোট্ট নাটমন্দিরটিও নবসাজে। এককোন ঘেঁষে উঁচু করে সেজ বাঁধা। সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতি, বিশিষ্ট সাধক আসেন আধ্যাত্ম পাঠ দিতে। এরপর নাচ, গান কবিতা ও নানা বক্তব্যে অংশ নেয় ছোট-বড় স্থানীয় অধিবাসীরা। একক কিংবা সংঘবদ্ধ, মাইক সহ, ডি.জে বাজিয়ে। অ্যামোচার পার্টির মিলনসভা। শ্রোতৃবৃন্দ ও যথেষ্ট চলল তিনদিন ব্যাপী। পাশে বসেছে রথমেলা, অপ্রসারিত পাকা রাস্তা রঙিন

রথযাত্রার পরই আসে “দেয়া-নেয়া” উৎসব। একালের রাখী বন্ধন উৎসব।

১৯০৫ সালে (শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমার) বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সম্মিলিত ও একতা টিকিয়ে রাখতে ১৬ই অক্টোবর এক বন্ধন উৎসব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে পালিত হয়েছিল। সেই ধারাই আজ রাখী বন্ধন।

ভাই-বোনের নিঃস্বার্থ ভালোবাসার বন্ধন মহাভারতের কাহিনী অনুসারে শিশুপাল বধের সময় দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণের রক্তাক্ত আঙ্গুলে শাড়ির আঁচল ছিঁড়ে বেঁধে দিলে কৃষ্ণ তাঁকে বোন হিসাবে মানেন, রক্ষাকবচ হিসাবে “অক্ষয় বস্ত্র” প্রদানের বচন দেন।

পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী পরবর্তীতে বস্ত্র হরণের সময় কৃষ্ণ সেই কথা রাখেন।

কাপড়ের ম্যারায়ে ঢাকা। রাস্তার দুপাশে ২২/২৩টি টেবিল জুড়ে নিয়ে বসেছে তাদের পসরা বা নিজস্ব শিল্পকর্ম। শাড়ি জামাকাপড়, দুল, চুরি, মালা, বডি-আচার, গাছগাছালি—কেউ থলে, ব্যাগ। সকলেই স্থানীয়, পসরা সবই প্রায় নিজ হাতে তৈরী, কোনো প্রতিযোগিতা নেই। সবাই যেন একই পরিবারের।

আমি এসেছি “রথ দেখতে কলা বেচতে”। ওই যে—গান্ধী সেবা সংঘের Skill Development এ মেয়েরা কাপড়ের ব্যাগ, সুতোর গহনা তৈরী করে—সেব নিয়ে। ভালো চাহিদা—শেখানোর সার্থকতা অনুভব করা গেল। এবার বলি খাদ্যপ্রেমীদেরও হতাশা নেই—মিলছে পাপড়, ঘুগুনী, পাপড়ি চট, ঝালমুড়ি, হাতে বানানো কেক-চকোলেট, লুচি-পরোটা, চা কোল্ডড্রিনকস—আবার ফিসফিসার, ফিস ফ্রাই। কিনে সকলে সকলকে ভাগ করে খাওয়াচ্ছে—সকলেই যে পরিচিত। আমি মুশকিলে, এক হাতে পাপড় নিয়ে অন্য হাতে পসরা দেখাচ্ছি, এদিক থেকে মন্দির কর্তৃপক্ষ বড় গামলা নিয়ে প্রসাদ বিতরণে আসছে, কি যে করি? দেখছি তিন-মাসের শিশু কোলে নিয়ে মা-বাবা নিশ্চিন্তে ঘুরছে।

স্থানীয় ডাক্তারবাবুর তার সুপারসিনিয়র বাবাকে ছইলচেয়ারে বসিয়ে স্বপরিবারে ঘুরছেন, কিনছেন, খাচ্ছেন, খাওয়াচ্ছেন। মেলা মানেই তো মিলনক্ষেত্র। উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে জনসমাগম। কিন্তু তাতে যেন এই ঘরোয়া আবেগ, প্রাণের স্পন্দন হারিয়ে না যায়।

আই.এস.আই (ISI)-এর একাল সেকাল

সুমনা ভট্টাচার্য

“দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের ওপর,
একটি শিশিরকিন্দু।”

বহুবছর আগে লেখা কবিগুরুর এই অমোঘ পঙ্ক্তিগুলি আজও যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় কাছের জিনিসকে অবহেলা করার প্রবৃত্তি। আমরা দেশের আনাচে-কানাচে গড়ে ওঠা নতুন আই.আই.টি (IIT)-গুলোর খবর যতটা রাখি, তার সিকিভাগও খোঁজ রাখি না খাস কলকাতার বৃক্কে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা প্রায় শতবর্ষী এক বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠানের। ঐতিহ্যবাহী এই প্রতিষ্ঠানটির জন্ম হয়েছিল প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের বেকার ল্যাবরেটরিতে।

সালটা ১৯৩১। স্ট্যাটিস্টিক্স বা রাশিবিজ্ঞানের তখন আজকের মতো এতটা পরিচিতি বা রমরমা ছিল না। বিশ্বজুড়ে তৎকালীন নামীদামী স্বনামধন্য দিকপাল ব্যক্তিগণের স্ট্যাটিস্টিক্সকে আলাদা বিষয়ের স্বীকৃতি দিতে তখন ভারী আপত্তি, ব্যঙ্গও শোনা যেত, জ্যোতিষ আর স্ট্যাটিস্টিক্স—এ তফাতটা কোথায়, দুটোই যখন ভবিষ্যৎ বলার কাজ করে। কাজেই প্রয়োজনে অঙ্ক, আবার কখনো প্রয়োজনে অর্থনীতি, কখনো জীববিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা বা মনস্তত্ত্ব-এর শাখা হিসেবে স্ট্যাটিস্টিক্স তার কাজ করেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের রাশিবিজ্ঞানীরা (যাদের এখন স্ট্যাটিস্টিসিয়ান বলা হয়) তখন কোনোভাবে নিজেদের কাজটুকু চালিয়ে নিচ্ছেন কখনো অঙ্ক আবার কখনো অর্থনীতি বিভাগে কাজ করতে করতে।

১৯১১ সালে যদিও কাল পিয়ারসন ইউনিভার্সিটি কলেজ লণ্ডনে, প্রথম স্ট্যাটিস্টিক্স বিভাগ গঠন করেন, তার পরেও বহুবছর অবধি বিশ্বে এটাই একমাত্র রাশিবিজ্ঞান বিভাগ ছিল। প্রথম স্নাতকোত্তর ডিগ্রি রাশিবিজ্ঞানে প্রদত্ত হয় ১৯৩১ সালে। সেই ১৯৩১ সাল রাশিবিজ্ঞানের ইতিহাসে উল্লেখনীয়। একদিকে লণ্ডনে Sir R. A. Fisher স্ট্যাটিস্টিক্সকে দিশা দেখালেন, অন্যদিকে ডিসেম্বর মাসে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের পদাধিকার অধ্যাপক প্রশান্ত চন্দ্র মহালনবিশ ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের বেকাব ল্যাবরেটরিতে শুরু করলেন আজকের আই.এস.আই.—ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট (Indian Statistical Institute)। তখনো অনেক সমস্যা।

তারপর দশক পরোলো, ভারত স্বাধীন হল। ভারত ভাগ-ও হল। ১৯৪৭-এ প্রধানমন্ত্রী হয়ে নেহেরুর সামনে এলো উদ্বাস্ত সমস্যা। উদ্বাস্ত ক্যাম্পে খাবারের দায়িত্বে থাকা কন্ট্রাক্টর যখন খাবারের প্রচুর খরচের বিল জমা দিলো নেহেরুর তো মাথাখ হাত। একে তো সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত শোষিত দেশ। তার মধ্যেই এ-কি আকাশছোঁয়া খরচ। একদিন কথাপ্রসঙ্গে বন্ধু প্রশান্তকে বললেন। প্রশান্ত দেখলেন খরচের খাতায় চাল-ডাল-শাক-সবজির পরিমাণ তো বেশিই, কিন্তু লবণতো অত বেশি নয়। প্রশান্ত পরীক্ষা করলেন, যে লবণের পরিমাণ নথিবদ্ধ আছে, তাতে কতজনের রান্না করা সম্ভব, কারণ রান্নায় সব মানুষ-ই পরিমিত লবণ খায়। বাস্তবে দেখা গেল সত্যিই তাই, দামি দামি সব জিনিসের পরিমাণেই কারচুপি করে রসিদ দেওয়া হয়েছে।

এই ঘটনার সূত্র ধরে পরবর্তীকালেও ভারতের সরকারি প্রকল্প নির্মাণ এবং কম্প্লেক্সিটিতে স্ট্যাটিস্টিক্স গ্রহণযোগ্যতা পেতে থাকে, আর এর পথিকৃৎ হিসেবে আই.এস.আই প্রতিষ্ঠানটি ভারত তথা বিশ্বে এক উল্লেখযোগ্য জায়গা অর্জন করে নেয়। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপরেখা তৈরিতে প্রশান্ত চন্দ্র মহালনবিশ এবং আই.এস.আই-এর আই.এস.আই-এর অবদান দেশের অর্থনৈতিক বিকাশে এক নতুন দিগন্ত খুলে দেয়।

কিন্তু আই.এস.আই.-এর এই গৌরবময় ইতিহাস আজ এক নতুন মোড় এসে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে আই.এস.আই.-এর ওপর নতুন বিল ইত্যাদি এনে সরকারের নতুন প্রস্তাবনা দিয়েছে, তাতে একটি বড় আশঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে। মনে করা হচ্ছে যে, আগামী দিতে হয়তো আর নিখরচায় এবং উস্টে স্টাইপেন্ড (Stipend) সহ ব্যাচেলরস (Bachelors) ও মাস্টার্স (Masters)-এর ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার সুযোগ থাকবে না। যদি এমনটা হয়, তবে তা দেশের অসংখ্য মেধাবী ছাত্রছাত্রীর জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি, যা এই বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠানের মূল ভিত্তি ও আদর্শকেই হয়তো ক্ষুণ্ণ করবে। জ্ঞানাস্থেয়ণের পথ থেকে মেধার এই সম্ভাব্য বিচ্যুতি রোধ করা আজ সময়ের দাবি।

ভালো বন্ধু, ভালো ভাবনা, ভালো বই—

এই তিনটি জিনিসই পারে একটি মানুষের জীবন বদলে দিতে। এই তিনটিই গান্ধী সেবা সংঘের আছে। অতএব, আমরাই পারি।।
তাই তো বলি—

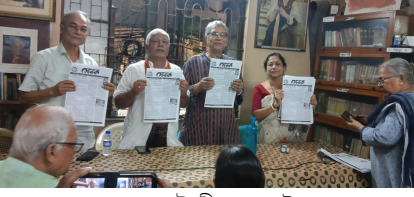
বই না পড়লেও মাঝে মাঝে লাইব্রেরিতে যান। বইয়ের দোকানে ঘুরে বেড়ান। পাতা না উল্টালেও বইগুলোর নাম দেখুন। কভারের গন্ধ নিন, লেখকদের নাম চিনুন। দেখবেন বইয়ের দুনিয়া আপনাকে আপনাকে টানতে শুরু করবে।

সেবকের এই সংখ্যা
থেকে পাঠকদের
মতামত আমরা
প্রকাশ করছি।

“আমরা পাঠকদের চিঠি
আহ্বান করছি।”

কৈশোরের সুখ স্মৃতিকথা— শান্তিনিকেতনে

জবা গুহঠাকুরতা



আমাদের প্রত্যেকেরই জীবনে ছোটো থেকে বড় হয়ে ওঠার সময় বহু ঘটনা এমন ঘটে যায় যা কোনোদিনও মন থেকে মুছে যায় না। সে সব ঘটনা কিছু সুখের, কিছু দুঃখের এবং বেশ কিছু খুব মজার ও আনন্দের। এরকমই একটি অত্যন্ত উপভোগ্য স্মৃতি সন্ধ্যা আমরা কাটিয়েছি গান্ধী লাইব্রেরী কক্ষে। সেদিন সূর্য ভট্টাচার্য মহাশয়কে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম তাঁর শান্তিনিকেতনের স্মৃতিকথা বলবার জন্য।

সূর্য ভট্টাচার্য মহাশয় শান্তিনিকেতন তথা বিশ্বভারতীর একজন প্রাক্তনী। সেখানে তিনি কেষ্টদা নামে পরিচিত। আমিও শান্তিনিকেতনের একজন প্রাক্তনী। দীর্ঘ বারো বছর সেখানকার আশ্রমে আমার পাঠ্যজীবন কেটেছে। আমাদের সঙ্গে সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন— সেও শিশুবয়স থেকেই শান্তিনিকেতনে প্রতিপালিত হয়েছেন ও শিক্ষালাভ করেছেন।

কেষ্টদার পিতা শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য মহাশয় সপরিবারে স্বয়ং দেশবিভাগের সময় বিশ্বভারতীতে উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। শান্তিনিকেতনে শিশুস্বপ্ন থেকে বড় হয়ে ওঠার সময় বনে জঙ্গলে কুল, পেয়ারা পাড়তে যাওয়া, সৈয়দ মুজতবা আলীর বাড়িতে আম পাড়তে গিয়ে ধরা পড়া, রামকিঙ্কর বেইজের নামে প্রস্তুি দেওয়া— এসব নিতানতুন দুষ্টিমির কথা কেষ্টদা সরসে বর্ণনা করেছিলেন। বৃষ্টির দিনে আশ্রমের পাঠশালা ছুটি হয়ে গেলে দলবোঁধে ক্লেপাই নদীর দিকে বেড়াতে যাওয়া হত। ছোটো ছোটো কগজের নৌকো বানিয়ে তাতে নিজের নাম লিখে ভাসিয়ে দিতেন এবং সেই অভিজ্ঞতা যখন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের লেখা ‘কাগজের নৌকা’ কবিতার সঙ্গে মিলে গিয়েছিল কেষ্টদার সেই মুহূর্তে অনাবিল আনন্দের কথা খুব সুন্দর করে বলেছিলেন। রাশভারী পিতার কাছে পড়াশোনাঅমনোযোগিতার কারণে যখন বর্ষনি ও প্রহার জুটতো তখন অভিমানে গৃহত্যাগ করতেন। কিন্তু কিশোর বালকের অভিমান রাত্রি শেষে কেটে যেত এবং ধীরে বাড়িতে ফিরে আসতেন। এসব বর্ণনা আমরা শ্রোতা দর্শকরা সবাই খুবই উপভোগ করেছিলাম।

শান্তিনিকেতনের আশ্রম জীবন কেষ্টদা, আমার ও সৌমিত্রের প্রায় একরকমই। সেসময় সেখানকার পরিবেশ ছিল খুবই সহজ, সরল ও আনন্দের। চারিদিকে গাছপালা এবং এক প্রাকৃতিক স্নিগ্ধতার মধ্যে বড় হয়ে ওঠা। শান্তিনিকেতনের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে যেমন ছিল প্রাচীন ঐতিহ্যের ভাবনা তেমনই ছিল আধুনিকতার ছোঁয়া।

সকালে বেতালিকে “ও পিতা নোহামি”— বেদমন্ত্র পাঠ ও গানের মধ্য দিয়ে দিনের কার্যাবলী আরম্ভ হত। মাস্তুরমশাইয়ের শাসন, ভালোবাসা, স্নেহ আমরা প্রতি মুহূর্তে অনুভব করতাম। আমাদের পাঠবনের “সাহিত্য সভা” ছিল অত্যন্ত শিক্ষণীয় একটি অনুষ্ঠান। ছাত্রছাত্রীরা যাতে শিশু বয়স থেকেই স্বাবলম্বী হতে পারে ছেলেমেয়েরাই দায়িত্ব নিয়ে সভাপতি ঠিক করছে, স্বরচিত কবিতা, গল্প, নাটক, নাচ পরিবেশন করছে। “সাধু”, “মাধু” রবে সব যোগদানকারীকে উৎসাহ দিচ্ছে।

শান্তিনিকেতনে বারো মাসে তেরো পার্শ্ব, যেমন— নববর্ষ, রবীন্দ্র জন্মোৎসব, বৃক্ষপোষণ, গান্ধী দিবস, হলকর্ষণ, বর্ষাঋতু, নাট্যোৎসব। সে সব মনোগ্রাহী অনুষ্ঠানে যোগদান করতাম। আজও শান্তিনিকেতনের নানা উৎসব মানুষকে আকর্ষণ করে। বসন্তোৎসব, পৌষমেলা তো খুবই জনপ্রিয় উৎসব। আমরা ছোটোবেলায় নানারকম আঞ্চলিক উৎসব যেমন টুঙ্গু গান, ভাদু গান, সাঁওতালী নাচ— উপভোগ করতাম।



বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বিখ্যাত গায়িকা সঞ্জিদা খাতুনকে কাছে কত যে মুক্তিযুদ্ধের গান শিখেছিলাম।

আশ্রমে দেশে বিদেশের বহু বিখ্যাত ব্যক্তিত্বকে দেখেছি— তা ভাবতেও অবাক লাগে। এরপরে সৌমিত্রও তার স্মৃতিকথায় শ্রীনিবেশ সম্পর্কে অনেক গল্প করল।

তার কথায় জানা গেল ১৯২২ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর মার্কিন কৃষিবিজ্ঞানী পিওনার্ড এলমহাস্ট মিলে সুরূপের একটি পুরনো কৃষিবাড়িতে গড়ে তোলেন গ্রামীণ পুনর্গঠন কেন্দ্র শ্রীনিবেশ। এর পটভূমি কবি বহু বছর আগেই মনে মনে তৈরি করছিলেন, যা প্রমাণ মেলে ১৯০৬ সালে নিজের পুত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আধুনিক কৃষিবিজ্ঞান শেখার জন্য আমেরিকায় পাঠানোয়। ১৯২১ সালে এলমহাস্টকে লেখা চিঠিতে কবি লিখেছিলেন, “আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত এই গ্রামের মানুষদের মনের সব জড়তা আর অসহায়ত্ব দূর করে দেওয়া, যাতে তারা নিজেদের জীবনটাকে নিজেরাই আনন্দের সাথে উপভোগ করতে পারে।” এই মন্ত্র নিয়ে কাজ শুরু দু-বছর পর, ১৯২৪ সালে গ্রামীণ শিশুদের জন্য ওখানেই চালু হয় শিক্ষাসংগ্রহ স্কুল।

শান্তিনিকেতনের স্কুল ‘পাঠভবন’— গাছের তলায় কবির পাঠশালা— ততদিনে প্রায় ২০ বছর ধরে সফলভাবে চলছে। কিন্তু কবি বুঝলেন, মধ্যবিত্তদের ওই স্কুল খেতে খাওয়া মানুষের ভাগ্য বদলাতে পারবে না। তাই দুই স্কুলের পাঠক্রম আলাদা হলো। পাঠভবনে চলত পড়াশোনার সঙ্গে গানবাজনা, সাহিত্য ও ছবি আঁকা, আর শিক্ষাসংগ্রহে গুরুত্ব পেলে বৈজ্ঞানিক চাষাবাস, কাঠমিস্ত্রির কাজ, তাঁত বোনো ও পশুপালন।

রবীন্দ্রনাথ জননেন, চাষাবাসের পরিশোধিত গ্রামের মানুষদের যদি একটা বাড়তি আয়ের পথ করে দেওয়া না যায়, তবে তাদের অর্থনৈতিক উন্নতি অথবা ই থেকে যাবে। সেই ভাবনা থেকে তৈরি হওয়া শ্রীনিবেশের শিক্ষাসদন হয়ে উঠল গ্রামীণ হস্তশিল্পের এক মস্ত বড় গবেষণাগার। চামড়ার ওপর বিশেষ ‘বাটিক’ ও খোদাইয়ের কাজ দেখতে পাওয়া যায় এখনকার বিখ্যাত চামড়ার ব্যাগে। এছাড়া ইন্দোনেশিয়া থেকে আনা বাটিকের কাজকে এখনকার সূতি ও সিল্কের কাপড়ে এক নতুন রূপ দেওয়া হয়েছিল, আর মৃৎশিল্পে আনা হয়েছিল গ্লেজিংয়ের আধুনিক ছোঁয়া। কাঠের আসবাব ইনলয়ের (Inlay) কাজ ছিল বিখ্যাত। এখনকার তাঁতে তৈরি পর্দা, বিজ্ঞানার চাদর সাধারণ মানুষের গৃহসজ্জায় এক অদ্ভুত সহজ-সরল, আধুনিক অথচ অল্প খরচের নতুন যারা নিয়ে আসে।

এখনকার উৎসবগুলিও ছিল অনন্য। ১৯২৮ সালে কবি শুরু করেন হলকর্ষণ উৎসব, যেখানে নাচ-গানের মাধ্যমে লাঙল ঝুঁয়ে মাটিকে শ্রদ্ধা জানানো হতো। এছাড়া মাঘ মাসে শ্রীনিবেশের জন্মদিন উপলক্ষে হয়ে আসছে গ্রামীণ লোকসংস্কৃতির মেলা, এবং বিশ্বকর্মা পূজার দিন কারিগরদের কাজের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে উদযাপিত হয় শিল্পোৎসব।

শুরুতে আমেরিকার ডেরোথি স্ট্রিটের (পরে ডেরোথি এলমহাস্ট) অনুদান, কবির বইয়ের রয়্যালটি আর সমবায়ের মাধ্যমে জিনিস বিক্রির টাকা দিয়ে শ্রীনিবেশের কাজ চলত। স্বাধীনতার পর ১৯৫১ সালে কেন্দ্রীয় সরকার শান্তিনিকেতনের সঙ্গে শ্রীনিবেশের ওপর দায়িত্ব নেয় এবং একে একটি ‘কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়’-এর মর্যাদা দেয়। তার পরে এই প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস কালের নিয়মে বদলেছে। এতদিন পরে, শহর আর গ্রামের আকাশছোঁয়া তফাৎের দিনে, স্বনির্ভর ও পরিবেশবান্ধব এই ‘শ্রীনিবেশ’ ভাবনা আমাদের সমাজের জন্য আজও ভীষণ দরকারি বলে মনে হয়।

গান্ধী সেবা সংঘ ও ‘সেবক’

সমর গাঙ্গুলী

গান্ধী সেবা সংঘ সেবার আদর্শে উৎসর্গীকৃত একটি প্রতিষ্ঠান, যার নাম কলকাতার সন্নিকটে পাতিপুকুর তথা শ্রীভূমি, দক্ষিণদাঁড়ি ও সন্নিকটে লেকটোউন অঞ্চলে একটি সুপরিচিত কিন্তু এই পরিচিত একদিনে আসেনি। এর পিছনে আছে বিগত আট দশকেরও বেশি সময় জুড়ে বহু মানুষের নিরলস ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টা।

স্বাধীনতার অনেক আগে থেকেই বিশেষ করে দক্ষিণদাঁড়ি অঞ্চলে বেশ কয়েকটি বড় বড় কলকারখানার সঙ্গে গড়ে উঠেছিল বেশ কিছু ছোট ছোট কারখানা। সেই সঙ্গে এই সব কলকারখানার বহু শ্রমিক কর্মচারীর বসতি গড়ে উঠেছিল এতদঞ্চলে। সেই সময়েই মহাত্মা গান্ধীর ভাবাদর্শে বিশ্বাসী কয়েকজন সম্ভ্রান্ত মানুষের উৎসাহে গান্ধী সেবা সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর দেশভাগের ফলস্বরূপ বহু ছিন্নমূল মানুষ আশ্রয় নিয়েছিলেন পাতিপুকুর ও সন্নিকটে অঞ্চলে। এছাড়া অনেক মানুষ এখানে জায়গাজমি কিনে বসবাস শুরু করেন। ফলে ক্রমশ এলাকাগুলি ঘনবসতিপূর্ণ হয়ে যায়।

এরপর সেইসব বসবাসকারীদের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনোর জন্য দক্ষিণদাঁড়ি অঞ্চলে একটি স্কুলের প্রয়োজন অনুভূত হয়। স্থানীয় ‘কালকাটা মিনারেলস’-এর কর্ণধার দুর্গাচরণ দত্তের দেওয়া তাঁর কারখানার দুটি ঘরে সাময়িকভাবে চালু হলো একটি প্রাইমারি স্কুল। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা যথেষ্ট না হওয়ায় স্থানীয় মানুষদের অনুরোধে আরেক বদান্য মানুষ পুলিশ চন্দ্র দাঁ তাঁর দু’বিঘারও বেশি একটি জমি সংঘকে দান করেন একটি পূর্ণাঙ্গ স্কুল প্রতিষ্ঠাকল্পে। সেই ছোট স্কুল কালক্রমে পরিবর্তিত হয়ে প্রথমে জুনিয়র হাই ও তারপর মাধ্যমিক স্কুলে উন্নীত হয়।

সংঘের কর্মকাণ্ড কিন্তু এখানেই থেমে থাকেনি। এলাকা ও সন্নিকটে অঞ্চলের বহু সুধীজনের সহযোগিতায় সংঘের নিজস্ব ভবন নির্মিত হয়, যেখানে কালক্রমে প্রতিষ্ঠিত হয় বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র দাতব্য হোমিওপ্যাথি ও অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসাকেন্দ্র, স্বনির্ভর কেন্দ্র, শিশুবিকাশ কেন্দ্র, যোগ শিক্ষা কেন্দ্র, গ্রন্থাগার, কমিউনিটি হল (মানিক্য মঞ্চ) ইত্যাদি ও সর্বোপরি দূরদূরত্ব থেকে আসা দরিদ্র ক্যান্সার রোগীদের থাকার জন্য ‘সেবা কেন্দ্র’। সংঘের প্রতিষ্ঠিত একটি ১০০ বোডের হাসপাতালও নির্মিত হয়েছে যার OPD ইতিমধ্যেই চালু হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু এই বিরাট কর্মজগৎ চালু রাখার জন্য প্রয়োজন আরও আরও অনেক সহায় মানুষের সাহায্য ও সহযোগিতা। এই জন্য আরও অনেকের কাছে সংঘের কাহিনি পৌঁছে দেবার প্রয়োজন অনুভূত হলো, আর এই প্রয়োজনবোধেই একটি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশের ভাবনা— যার ফলশ্রুতি এই ‘সেবক’ পত্রিকা।

‘সেবক’ আক্ষরিক অর্থেই সার্থকনামা। প্রথম সংখ্যা থেকেই এটি যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছে। সেবক সংঘের নানান কর্মকাণ্ড ছাড়াও দৈনন্দিন কাজকর্ম, ভবিষ্যৎ চিন্তাধারা মানিক্য মঞ্চ নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কর্মশালা, প্রদর্শনী ও সমসাময়িক বিষয়ের ও বিভিন্ন প্রসঙ্গের ওপর আলোচনা ইত্যাদি এমন সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে যাতে সেবকের সৌজন্যে পাঠকবৃন্দ গান্ধী সেবা সংঘের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করতে পারেন, সংঘের কর্মধারার সঙ্গে নিজেদেরকে ও চারপাশের আরও অনেক সুধীজনকে যুক্ত করতে উৎসাহিত হতে পারেন। তাঁদের মতামত ও সক্রিয় অংশগ্রহণ শুধু পত্রিকাটিকেই আরও সমৃদ্ধ করে তুলবে না, আগামী দিনে গান্ধী সেবা সংঘকেও তার আরও কর্মসূচিকে আরও সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে সাহায্য করবে।

চিঠি, যা কখনও পৌঁছায়নি

দেবাদৃতা রায়চৌধুরী

কলকাতার সেই পুরোনো স্কুলটার গন্ধ আজও ঠিক একই রকম। দুপুরের রোদে লাল ইন্টার দেওয়ালগুলো যেন আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। করিডোরে চকআর পুরোনো বইয়ের মিশ্র গন্ধ, মাঠের এক কোণে বিশাল কৃষ্ণচূড়া গাছ, আর ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যাওয়া একদল কিশোর-কিশোরী— সব মিলিয়ে যেন সময় এখানে একটু ধীরে হাঁটে।

এই স্কুলেই নবম শ্রেণিতে পড়ে ঋদ্ধ।

বন্ধু আছে, পড়াশোনাও মন্দ নয়, তবু ওর মনে হয়— এই পুরোপুরি বোঝে না। বাবা ব্যস্ত অফিসে, মা সারাদিন সংসারের কাজে। বাড়িতে সবাই ওকে ভালোবাসে, কিন্তু সেই ভালোবাসার মাঝেও কোথায যেন একটা ফাঁকা জায়গা থেকে যায়।

তাই চিঠি লেখার সময় অন্যরা যখন মাঠে ক্রিকেট খেলতে যায়, ঋদ্ধ চলে যায় লাইব্রেরিতে। স্কুলের লাইব্রেরিটা যেন অন্য এক পৃথিবী। বইয়ের আলমারিগুলো এত উঁচু যে মনে হয় তারা ছাদ ছুঁয়ে ফেলবে। ধুলোজমা মালাট, হলদে হয়ে যাওয়া পাতা, আর কোণের টেবিলে বসে থাকা বৃদ্ধ গ্রন্থাগারিক শশাঙ্কবাবু— সবকিছুতেই এক অদ্ভুত শান্তি।

সেদিনও ঋদ্ধ একটা গল্পের বই খুঁজছিল। হঠাৎ একটা মোটা বই টেনে বের করতেই ভাঁজ করা একটা খাম মেঝেতে পড়ে গেল। খামটা পুরোনো। ঋদ্ধজের রং ফিকে হয়ে গেছে। ওপরের দিকে নীল কালিতে লেখা— “যে পড়বে, সে যেন শেষ পর্যন্ত পড়ে।”

ঋদ্ধ অবাক হয়ে চারদিকে তাকাল। কেউ দেখছে না। ধীরে ধীরে খামটা খুলল। ভেতরে এক টুকরো চিঠি।

“প্রিয় বন্ধু,”

“তোমার নাম আমি জানি না। তুমি কোন বছরে এই চিঠি পড়বে, তাও জানি না। হয়তো তখন আমি অনেক দূরে চলে গেছি। তবু লিখছি। কারণ কিছু কথা মানুষ ঝড়কেবলতে পারে না। ঋদ্ধজকেবলতে পারে।”

“আজ স্কুলে সবাই খুব আনন্দ করছিল। অথচ আমার মনটা খুব খারাপ। বাবা বললেন, আমাদের গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে। এই স্কুল, এই মাঠ, এই কৃষ্ণচূড়া— সব ছেড়ে। বন্ধুদেরও বলতে পারিনি। বিদায় বলতে খুব কষ্ট হচ্ছে।”

“যদি কখনও তুমি এই চিঠিটা পড়ো, তাহলে একটা কাজ করবে? স্কুলের মাঠে কৃষ্ণচূড়া গাছটার নিচে একবার দাঁড়িয়ে থেকো। আমি হয়তো থাকব না, কিন্তু আমার অনেকগুলো বিকেল সেখানে রয়ে যাবে।”

“অর্ঘব, ১৯৮৮”

চিঠিটা পড়ে, সে দিন ছুটি হওয়ার পরে ঋদ্ধ ভারী মনে একা একা কৃষ্ণচূড়া গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকলো “সে এখন কোথায়?” হাওয়ায় শুকনো ফুল ঝরে পড়ছে।

পরদিন সে চিঠিটা নিয়ে শশাঙ্কবাবুর কাছে গেল। বৃদ্ধ চশমাটা খুলে অনেকক্ষণ ধরে চিঠিটার দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর খুব আন্তে আন্তে বললেন, — “অর্ঘব—”

নামটা যেন তিনি বহু বছর পরে আবার উচ্চারণ করলেন।

ঋদ্ধ অবাক হয়ে বলে, — “আপনি চেনেন?”

শশাঙ্কবাবু মৃদু হেসে বললেন, — “চিনি তো। খুব ভালো চিনি। ও ছিল এই লাইব্রেরির সবচেয়ে নিয়মিত

পাঠক। দেখো, ও একদিন অনেক বড়লেখক হবে।”

কিছুক্ষণ থেমে জানালার বাইরে তাকিয়ে বলল— “ওরা শহর ছেড়ে চলে গেছে।”

ঋদ্ধ চুপ।

বৃদ্ধ আরো বললেন, — “জানো, কিছু মানুষ চলে যায়, কিন্তু তাদের স্বপ্নগুলো কোথাও থেকে যায়।”

সেই দিন থেকেই ঋদ্ধর মনে অদ্ভুত একটা কৌতূহল জন্মাল। অর্ঘব কি সত্যিই লেখক হয়েছিল? নাকি জীবনের ভিড়ে হারিয়ে গিয়েছিল? পরের কয়েক সপ্তাহ ধরে স্কুলের পুরোনো ম্যাগাজিন, অ্যালবাম, রেজিস্টার— যা পায়, সব ঘাঁটতে শুরু করল সে। একদিন স্কুলের বার্ষিক পত্রিকার ১৯৯৭ সালের সংখ্যায় একটা গল্প পেল। লেখকের নাম— অর্ঘব মুখার্জি। গল্পের শেষ লাইনটা পড়ে ঋদ্ধর শরীর শিউরে উঠল। “মানুষ চলে যায়, কিন্তু যে কথা বলা হয়নি, তারা কখনও মরে না।”

ঠিক কথাটা ই তো যেন চিঠির ভেতরও ছিল। ঋদ্ধর মনে হল, সে যেন একজন অচেনা মানুষের সঙ্গে ধীরে ধীরে বন্ধুত্ব করে ফেলেছে।

শীতের ছুটির ঠিক আগে স্কুলে ঘোষণা হল— এবারের বার্ষিক পত্রিকায় ছাত্রদের মৌলিক গল্প আহ্বান করা হচ্ছে। সারা ক্লাস উত্তেজিত। কেউ ভূতের গল্প লিখবে, কেউ রহস্য। ঋদ্ধ বাড়ি ফিরে সাদা কাগজ নিয়ে বসে রইল। অনেকক্ষণ কলম চলল না। তারপর হঠাৎ মনে পড়ল সেই চিঠির কথা। একজন অচেনা ছেলে, যে হয়তো কোনোদিন ভাবতেই পারেনি— তার লেখা এত বছর পরে আরেকজনের হৃদয়ে আলো জ্বালাবে।

ঋদ্ধ লিখতে শুরু করল। শব্দের পর শব্দ। বাক্যের পর বাক্য। রাত কেটে ভোর হয়ে গেল। গল্পের শেষে সে লিখল— “যদি কোনোদিন আমার লেখা কোনো অচেনা মানুষের মন ছুঁয়ে যায়, তাহলে বুঝবে— সব চিঠির ঠিকানা হয় মানুষের হৃদয়।”

দুই মাস পরে বার্ষিক অনুষ্ঠানে প্রথম পুরস্কার ঘোষণা হল। প্রথম পুরস্কার— ঋদ্ধ সেন। হলঘরের হাততালি থেমে গেল। শশাঙ্কবাবু ওকে আলাদা করে ডাকলেন। হাতে একটা ছোট্ট বাক্স। — “এটা তোমার জন্য।”

ভেতরে ছিল একটা পুরোনো ফাউন্টেন পেন। কালো রঙের। ঢাকনার ভেতরে ছোট করে খোদাই করা— “অর্ঘব”।

ঋদ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল।

শশাঙ্কবাবু বললেন, — “ও চলে যাওয়ার দিন এই কলমটা আমাকে দিয়ে বলেছিল— “যেদিন এমন কাউকে পাবেন, যে সত্যিই গল্পকে ভালোবাসে, ওকে দিয়ে দেবেন। আজ মনে হচ্ছে, চিঠিটা অবশেষে তার ঠিকানায় পৌঁছেছে। আমিও অপেক্ষায় ছিলাম।”

স্কুলের বাইরে তখন বিকেলের আলো নরম হয়ে এসেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখিরা কৃষ্ণচূড়া গাছটার ডালে ফিরে আসছে।

ঋদ্ধ সময়ের বুকে বছরের পর বছর ঘুমিয়ে থাকা চিঠিটির কথা ভাবতে ভাবতে কলমটি নিয়ে নীরবে বাড়ি ফিরে এল।

গান্ধী সেবা সংঘের উদ্যোগে মর্যাদার সঙ্গে পালিত হল ৮০তম স্বাধীনতা দিবস

মধুমিতা মোদক



গান্ধী সেবা সংঘের আয়োজনে যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসাহের সঙ্গে পালিত হল ভারতের ৮০তম স্বাধীনতা দিবস।

সকাল ঠিক সাড়ে দশটায় সংঘ ভবনের সামনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন সংঘের প্রবীণতম সদস্য, প্রাক্তন সভাপতি ও প্রধান উপদেষ্টা শ্রী রঘুনাথ কুন্ডু মহাশয়। এসময় সংঘের সভাপতি, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ সহ অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। পতাকা উত্তোলনের পর জাতীয় সংগীত ও “বন্দে মাতরম” পরিবেশনের মাধ্যমে সকলে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন।

এরপর সকলে সমবেত হন মানিক্য মঞ্চ। সম্মেলক উদ্বোধনী সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা, অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ড. হিরণ্ময় সাহা। তিনি সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর বক্তব্য রাখেন গান্ধী সেবা সংঘ বিনিয়াদি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রী অর্পেন্দু রায়। মঞ্চ উপস্থিত ছিলেন সংঘের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং গান্ধী সেবা সংঘ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

প্রতি বছরের মতো এবারও বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় সার্টিফিকেট, পদক ও অর্থ পুরস্কার। এরপর বিদ্যালয়ের দুই বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেড় ঘণ্টা ধরে পরিবেশন করে। অনুষ্ঠান শেষে সকল ছাত্র-ছাত্রীর জন্য টিফিন ও সকলের জন্য মিষ্টিমুখের ব্যবস্থা করা হয়।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে প্রতি বছরের প্রথা অনুযায়ী এদিনও সেবা নিবাসে থাকা রোগীদের হাতে ফল ও মিষ্টি তুলে দেওয়া হয়। এবছর সংঘের ৩৬টি ঘরের রোগীদের জন্য ফলের ব্যবস্থা করেন সংঘের প্রধান উপদেষ্টা শ্রী রঘুনাথ কুন্ডু মহাশয়।

পাঠকের দরবারে

সেবক পত্রিকা পড়ে খুব ভালো লাগল। মহাত্মা গান্ধীর অল্লান আদর্শ— সত্য, অহিংসা এবং নিঃস্বার্থ মানবসেবা— এই মূলবোধগুলোকে ধারণ করে গান্ধী সেবা সংঘ যেভাবে সমাজের প্রতিটি স্তরে আলো ছড়িয়েছে, তা অত্যন্ত অনুপ্রেরণাদায়ী। সুবিধাবঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া মানুষদের কল্যাণে তাঁদের সুপরিচালিত উদ্যোগ, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সেবামূলক কর্মসূচি সমাজের জন্য এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। দেখলাম ‘সেবক’ পত্রিকা। বস্তুনিষ্ঠ ভাবনা, সমাজসুখী চেতনা এবং সেবামূলক বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে এই পত্রিকা এক গুরুত্বপূর্ণ সেতু হিসেবে কাজ করেছে। গান্ধী সেবা সংঘের প্রতিটি পরিকল্পনা ও আগামী দিনের প্রতিটি মানবিক পদক্ষেপ সফল হোক। ‘সেবক’ পত্রিকার উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও বহুল প্রচার কামনা করি। এই মহৎ যাত্রার সাথে যুক্ত সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শ্রদ্ধা।

— প্রিয়ান্বিতা ভূঁইয়া

নেপাল— বিশ্ব উষ্ণায়নের শিকার

নির্মল ঘোষ



নেপাল চীন সীমান্তে, মানস সরোবর কৈলাস পর্বত তীর্থযাত্রার পথে, গত ২৬ শে আগস্ট এ্যাটম বোমা বিস্ফোরণের মতো ভয়াবহ হিমবাহ পতন হলো। বিশাল আকারের জল পাথর কাদার দেয়াল চাপা পড়ে কয়েক হাজার মানুষ মলত বা নিখোঁজ হলো হাজার বছরের ঐতিহ্যময় বেত্রবতী গ্রাম তার সমস্ত বাড়ি গর হাট বাজার স্মৃতিসৌধ ও মানুষজন নিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল হাজার হাজার স্থানীয় মানুষ ঘর ছাড়া নিঃসহায় অভিবাসী হয়ে গেলেন।

এত ভয়ংকর দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা স্থির সিদ্ধান্তে এসেছেন যে বর্তমান ক্রমবর্ধমান বিশ্ব উষ্ণায়নই এর মূল কারণ। গত কয়েক দশকে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ১.৩ থেকে ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে সারা পৃথিবীতেই হিমবাহ গুলো এবং মেরু দেশের বরফ গলতে শুরু করেছে। এ বছর গ্রীষ্মকালে ইউরোপে ভয়ংকর তাপপ্রবাহে কেবল ফ্রান্সেই ৬০০০ মানুষ মারা গেছে। ২০২৪ সালের তীব্র তাপপ্রবাহ ইউরোপে প্রায় ৬১০০০ মানুষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। এবছর নেপালেও তীব্র গরমে হিমবাহের জায়গায় জায়গায় বরফ গলতে শুরু করে। ফলে পর্বতের উপর হিমবাহের দৃঢ়ভাবে অবস্থান নড়বড়ে হয়ে যায়। আর হিমবাহ হ্রদের বিস্ফোরণ (glacial lake outburst flood) ঘটে।

একে তো বিশ্ব উষ্ণ উষ্ণায়নের প্রভাব তার উপরে আবার হিমালয় পর্বতের বিভিন্ন অঞ্চলে বড় বড় পাহাড় ভেঙে সুড়ঙ্গ তৈরি হচ্ছে, রাস্তা তৈরি হচ্ছে, জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য নদীর স্বাভাবিক জলপ্রবাহের নানারকম পরিবর্তন আনা হচ্ছে। এই সমস্ত অদূরদর্শী কার্যক্রম পাহাড়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্ভাবনা অনেক বাড়িয়ে দিচ্ছে।

শুধু নেপালে নয় এই ধরনের ভয়াবহ দুর্ঘটনা কেবলমাত্র নেপালে যে ঘটে তা নয়, থাইল্যান্ড থেকে শুরু করে সুইজারল্যান্ড পর্যন্ত এই রকম পাহাড় ভেঙে পড়া ও হঠাৎ বন্যার ঘটনা গত কয়েক বছরে ঘন ঘন ঘটছে।

২০২৪ সালে সুইজারল্যান্ডের আল্পসের তুষারবৃত্ত শৃঙ্গ গলনের ফলে অনেক মানুষের প্রাণহানি ও প্রায় নয় হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছিল। সুইজারল্যান্ডে গত বছর মে মাসে তুষার ধস কাদা ও পাথরের ঝোতের তলায় গ্রামে নামক একটি গ্রাম প্রায় চাপা পড়ে গেছে। গত ২৬ আগস্ট চীন তিব্বত সীমান্তের গাইরুঙ গ্রামটি এবং নেপালেরও বসুয়া জেলার অনেকটাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

জলবায়ুর ন্যায়বিচার

নেপালের এই ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের মূল কারণ বিশ্ব উষ্ণায়ন এই ধারণা প্রকাশ হওয়ায় পরেই জলবায়ুর ন্যায় বিচারের (Climate justice) দাবি সোচ্চার হয়ে উঠেছে। বিশ্ব উষ্ণায়নের মূল হোতারা হচ্ছে উন্নত দেশগুলি যেমন আমেরিকা চীন ইউরোপ জাপান ভারত ইত্যাদি। আর বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তথাকথিত অনুন্নত দেশ যেমন নেপাল বাংলাদেশ কেনিয়া নাইজেরিয়া ইত্যাদি। কাজেই উষ্ণায়নে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলির ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দায়িত্ব বর্তায় ন্যায়তা উন্নত দেশগুলির।

নেপালের এই ভয়ংকর প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশ্ব উষ্ণায়নকে আরো অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়ে ভাবার জন্য ও প্রতিকারের ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নির্দেশ দিচ্ছে। যদি এখনো আমরা নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকি, যেমন চলছে তেমনি চলুক মনোভাব নিয়ে দিনকটাই, তাহলে অচিরেই সমুদ্রে জলস্ফীতি প্লাবনে পৃথিবীর বহু শহর যেমন ব্যাংকক মুম্বাই কলকাতা ঢাকা আমস্টারডাম নিওঅরলিয়েন্স ইত্যাদি জলের নিচে চলে যাবে। কোটি কোটি মানুষের অভিবাসন হবে। তীব্র অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটে মানুষ সমাজ পারম্পরিক বৃদ্ধি ও সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে দ্রুত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাবে।

সেবক পত্রিকার প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখতে একান্তিক সহযোগিতায়
বাসুর এভিনিউ থেকে সুচিটা দাস

‘সেবক’ পত্রিকার হিতাকাঙ্ক্ষী — বাসুদেব ঘোষ

দীর্ঘ আট দশকের বেশি সময় ধরে সাধারণ মানুষের সেবায়

গান্ধী সেবা সংঘ

(একটি অবাণিজ্যিক, অরাজনৈতিক স্বৈচ্ছাসেবী সংস্থা)

লক্ষ্য ও কর্মক্ষেত্র : শিক্ষা-সেবা-স্বনির্ভরতা

●গান্ধী সেবা সংঘ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন ●দূর-দূরান্ত থেকে আসা ক্যানসার রোগীদের চিকিৎসাবীন সুলভ বাসস্থান ●‘সেনানিবাস’ (৩৬টি ঘর, রান্নাঘর, আরোগ্যয়ান, লিফট ও অন্যান্য সুবিধা সহ) ●গান্ধী সেবা সদন হাসপাতাল স্থাপনা ●অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, ফিজিওথেরাপি কেন্দ্র ও চোখের চিকিৎসা (ওষুধ ও চশমা সহ) ●পাবলিক লাইব্রেরী (১৩ হাজার বই সহ) স্থাপনা ও পরিচালনা (সপ্তাহে ৭ দিন ৫.৩০ থেকে ৮.৩০) ●দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুবক-যুবতীদের স্বনির্ভর হতে সাহায্য করা ●‘মাণিক্য মঞ্চ’ ও ‘ভাস্কর সুনীল পাল প্রদর্শনশালা’র মাধ্যমে অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলের সার্বিক উন্নতি সাধন ●বয়স্ক নাগরিকদের মানসিক ও অন্যান্য সহায়তার জন্য গঠিত ‘উত্তরণ’ ●কিশোর-কিশোরীদের ছবি আঁকা, আবৃত্তি শিক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে নানা বিষয়ে উৎসাহিত করা।

এই কল্যাণকারী কর্মযজ্ঞে আপনিও সামিল হোন, গান্ধী সেবা সংঘে আসুন। সব কটি প্রকল্পই দেশ ও বিদেশের নানা সংস্থা ও সাধারণ মানুষের সাহায্য ও দান নির্ভর আয়কর দপ্তরের ৮০জি ধারায় সমস্ত দান আয়কর মুক্ত

গান্ধী সেবা সংঘের ঠিকানা :

গান্ধী মোড়, ২০৭/১, এস. কে. দেব রোড, শ্রীভূমি, কলকাতা ৭০০০৪৮

Gandhi Seva Sadan Hospital 99033 21777, Physiotherapy 93308 30972 (4-8 pm)

ওয়েবসাইট : www.gandhisevasanghakolkata.org

ই-মেল : gandhisevasangha1946@gmail.com ফেসবুক : Gandhi Seva Sangha

যোগাযোগ : সাধারণ সম্পাদক : ০৩৩-২৫২১৪০১১/৯৪৩২০০২৬০

‘সেবক’-সংক্রান্ত চিঠিপত্র পাঠানোর জন্য—হোয়াটসঅ্যাপ - ৮২৪০৯১৬৫২৫

গান্ধী সেবা সংঘের বিভিন্ন কর্মযজ্ঞে উদার হস্তে দান করুন

সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন নং— WB19727/148, 1951-52 dt. 30 May 1951

এনজিও রেজিস্ট্রেশন আইডি— ডব্লিউ বি/২০১৭/০১৬৭৬০৮

বৈদেশিক দান গ্রহণ (FCRA) রেজিস্ট্রেশন নং— ১৪৭১১০৪২ তাং- ২৯/০৪/৮৬ পর্যন্ত

সিএসআর (CSR) রেজিস্ট্রেশন নং— 00022336 dt 12.2.2022

৮০জি ধারার সার্টিফিকেট নং— DIT8E/330/2011-12G-16/2012-13

প্যান নং— AABTG1815G

Bank Name

A/C name + number

Bank of Baroda, Lake Town

Gandhi Seva Sangha, Dakhindari

(For Cancer donation only)

77790100002466

P.N.B. Sreebhumi

Gandhi Seva Sangha

0865010022233

Follow us on

AGNI
Empowering greener tomorrow

Make your Home Solar-Powered with **PM SURYA GHAR MUFT BILJI YOJNA**

INSTALL SOLAR FOR YOUR HOME STARTING AT JUST ₹65,000/-*

REDUCE YOUR ELECTRICITY BILL UPTO 90%*

Benefits :

- 5 Years of Free Operation & Maintenance
- Invest Now and Enjoy Benefit for 25 Years
- Up to 10% Return on Your Investment
- Loan Facility Available with Low Interest from Nationalised Banks
- Recover Your Investment Within 3.5 Years*

WHY AGNI?
We Don't Just Install Solar. We've Seen it Through. With 30+ years of experience, we've witnessed the complete life cycle of a Solar Plant.

- Customized end to end solution provider
- Dedicated service team for after sale service
- Own manufacturing and R&D facility
- PAN India Trusted Service Network
- Cumulative 100MW+ installed capacity
- Kolkata Based Renowned Solar EPC Company

Get Govt. Subsidy up to **78000/-** + WB State Subsidy + Plant Insurance Coverage

AGNI GREEN POWER LIMITED
A Complete Solution for Solar EPC System, Solar Roof-Top System, Solar Street Lights, Solar Water Pump, Solar PCU, Remote Monitoring System

CALL NOW 84201 19789 / 85848 67193 | www.agnipower.com

গান্ধী সেবা সংঘের পক্ষে গৌতম সাহা কর্তৃক ২০৭/১, এস কে দেব রোড, কলকাতা-৭০০০৪৮ থেকে প্রকাশিত ও এন.আই.সি.জি. বারাসাত, কলকাতা-১২৪ মাধ্যমে মুদ্রিত।

সম্পাদক: শীলা রায়